নবকলি

কলি

সম্পাদক শ্রী নলীগোপাল দত্ত

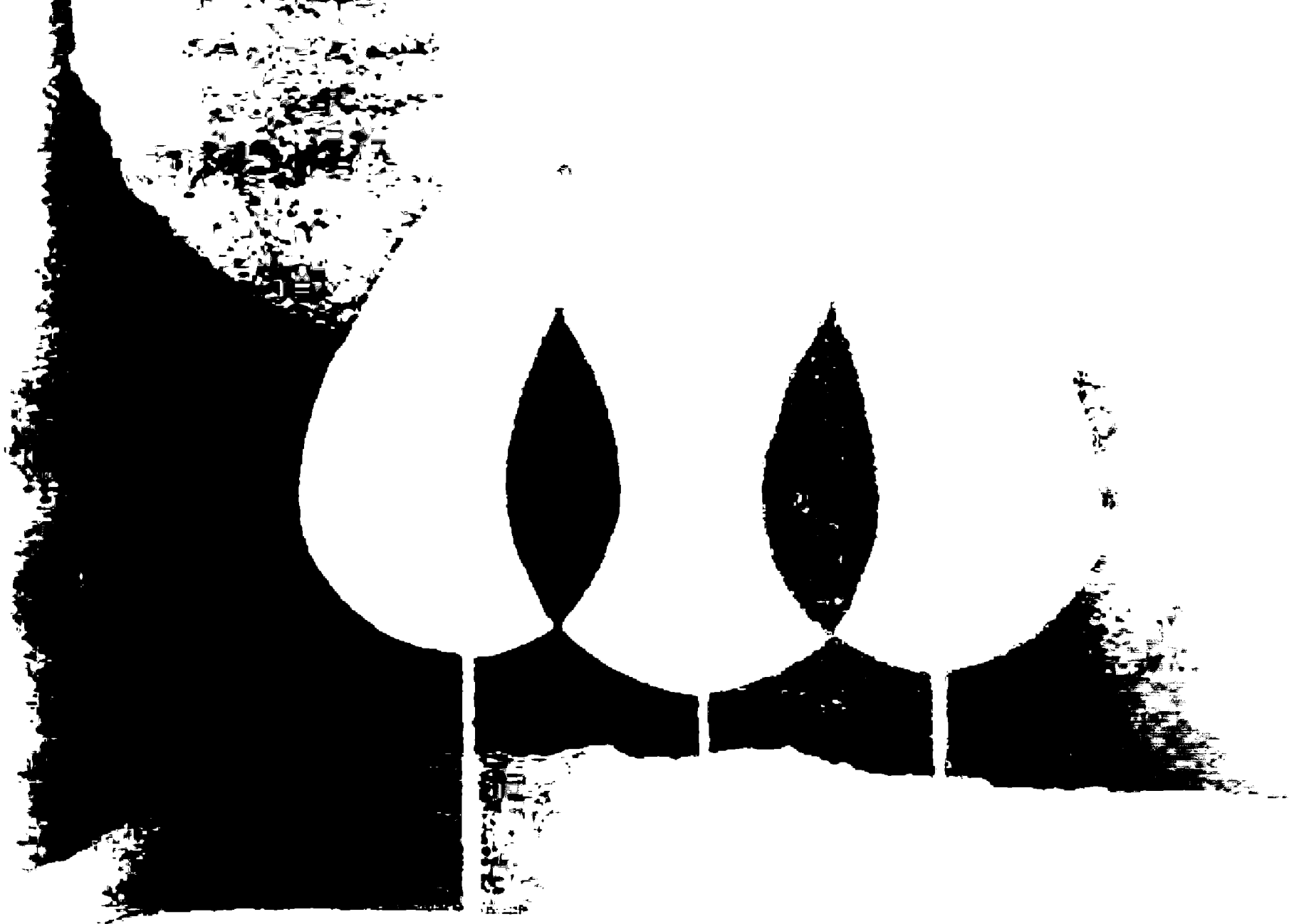

বৈশাখ ১৩৮১

বৈশাখ, ১৩৮১

"Your Excellency, the enormity of the measures taken by the Government in the Punjab for quelling some local disturbances has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India.....The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous contest of humiliation, and I for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of those of my countrymen, who, for their so-called inisignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings. And these are the reasons which have painfully compelled me to ask Your Excellency, with due deference and regret, to relieve me of my title of Knighthood which I had the honour to accept from His Majesty the King at the hands of your predecessor, for whose nobleness of heart, I still entertain great admiration."

—Rabindra Nath Tagore.

নবকলি

।। উপদেষ্টা মণ্ডলী ।।

নাট্যকার মন্মথ রায় — শ্রীদক্ষিণা রঞ্জন বসু

শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় — ,, নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য

বিজ্ঞাপন সচিব—শ্রীধূর্জটি দত্ত

।। নিয়মাবলী ।।

- নতুন স্বাদের অভিজাত ত্রৈমাসিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা 'নবকলি' প্রতি বছর বৈশাখ, শ্রাবণ, আশ্বিন ও পৌষ মাসে প্রকাশিত হয়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য পঞ্চাশ পয়সা। গ্রাহক চাঁদার হার বার্ষিক (সডাক) দু'টাকা। যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া চলে।
- যে কেউ লেখা পাঠাতে পারেন। লেখা কপি রেখে পাঠাবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রগতিশীল রচনা বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়।
- চিঠির জবাব পেতে হলে সাথে উপযুক্ত ডাক টিকেট থাকা দরকার।
- বিজ্ঞাপনের হার :—
  সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা—১০০ টাকা
  সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা—৬০ টাকা
  সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা—৩০ টাকা
- প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম শনিবার সন্ধ্যা ৬ টায় 'নবকলি' কার্যালয়ে একটি সাহিত্য সভা হয়। সাহিত্যানুরাগী যে কেউ যোগদান করতে পারেন।
- সম্পাদকীয় দপ্তরে সাক্ষাতের সময় সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত।
- টাকা পয়সা প্রকাশকের নামে পাঠাবেন। সব যোগাযোগের ঠিকানা :

  ব্লক—জি, ফ্ল্যাট—৪,
  হাউজিং এস্টেট, এল. আই. জি.
  ৩৭, বেলগাছিয়া রোড,
  কলিকাতা—৩৭।

।। প্রচ্ছদ ।।

অলংকরণ—চিত্ত সরকার ।। ব্লক—রেডিয়েন্ট প্রসেস্

কালের বাণী

ভালবাসা অর্থে আত্মসমর্পণ নহে। ভালবাসা অর্থে, নিজের যাহা কিছু ভাল তাহাই সমর্পণ করা।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

।। বিষয় সূচী ।।

১।	আমাদের কথা		২২১
২।	বাইশে শ্রাবণ (নাটা আলেখ্য)	নাট্যকার মন্মথ রায়	২২২
৩।	গোপাল বিরচিত (ফিচার)	গোপাল	২৩২
৪।	লাল-নহলা (রহস্য উপন্যাস)	সত্যগোপাল বসু	২৩৫
৫।	বীণা রায় (কবিতা)	উমাকান্ত দত্ত	২৮৬
৬।	হে কবি ! (কবিতা)	শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত	২৪৭
৭।	ক'টি ছড়া (কবিতা)	নিখিল রঞ্জন চক্রবর্তী	২৪৯
৮।	Have I dawned ! (Poem)	Jyotish Ganguly	২৫০
৯।	অনুমতি (গল্প)	কুমারেশ ঘোষ	২৫১
১০।	ভারতের আইন ব্যবস্থা ও মহিলা সমাজ (অংগণা / ফিচার)	অরুণা মুখোপাধ্যায়	২৫২
১১।	পুরোটা দিন (গল্প)	বোম্মানা বিশ্বনাথম্	২৫৪
১২।	ডায়েরী (ফিচার)	ফাদার লাফোঁ	২৬১
১৩।	ধর্মক্ষেত্র (গল্প)	সৌমিত্র বসু	২৬৩
১৪।	নীতা (গল্প)	সমীর কুমার দত্ত	২৬৬
১৫।	শতাব্দীর অভিশাপ (কবিতা)	শ্রীঅজিত কুমার ব্যানার্জী	২৬৮
১৬।	কবি রবির কৌতুক-কণা (বিবিধ)	শ্রীঅখিল নিয়োগী	২৬৯
১৭।	কয়েক মুহূর্তের জন্য (সাক্ষাৎকার)	শ্রীগোপাল ভৌমিক	২৭৫
১৮।	নতুন বই (সমালোচনা)	সুবীর মুখোপাধ্যায়	২৭৭
১৯।	শব্দ-দ্বন্দ্ব (প্রতিযোগিতা)	শুক্লা চট্টোপাধ্যায়	২৭৯
২০।	নাট্যকলা সৃষ্টির নতুন যুগে (নাট্যম্)	নাটুকে বাবু	২৮১

পরবর্ত্তী সংখ্যা

আমাদের পরবর্ত্তী সংখ্যা আগামী শ্রাবণে প্রকাশিত হবে । এটি 'নবকলি'র তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা । নিয়মিত ফিচার ছাড়া নতুন একটি আকর্ষণীয় ফিচার এতে পাবেন—'কৌতুক-কণা' । এছাড়া বিগত বছরের (দ্বিতীয় বর্ষ) বার্ষিক সূচীপত্র এতে দেওয়া হবে ।

● নবকলি ●
ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা
বৈশাখ, ১৩৮১

আমাদের কথা

আবার এলো পঁচিশে বৈশাখ—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্ম দিন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এই স্বল্প পরিসরে কি আর বলবো! তাঁর কাব্যে রোমান্টিকতা, গানে জীবনের সুর, রচনায় সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সব কিছু ভাবনার সমাধান। এক কথায় স্বয়ং সম্পূর্ণ সাহিত্য। আমরা গর্বিত—রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাংগালী।

এই শুভ দিনটিতে তাঁর স্মৃতি পূজা করা হয়। তার সার্থকতা নিয়ে আমাদের পত্রিকায় এর আগে আমরা অনেক আলোচনা করেছি। পুরনো আলোচনায় আজ আর যাচ্ছিনে। যে কথাটা আজ বলতে ইচ্ছে হ'চ্ছে তা হ'ল—মানুষ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু খাঁটি কথা, কিছু সত্য ভাষণ শুনতে চাই।

রবীন্দ্রজীবী যাঁরা—সেই তথাকথিত রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞদের কচকচি আমরা অনেক শুনেছি। যে আশংকাটা আমাদের পীড়া দেয় তা' হ'ল, এঁরা রবীন্দ্র প্রতিভায় আচ্ছন্ন। এঁদের পাণ্ডিত্যের আড়ালে মানুষ রবীন্দ্রনাথ হারিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথকে একেবারে নিকট থেকে দেখেছেন যাঁরা, তাঁর দৈনন্দিন জীবনের বহু খুঁটিনাটি ঘটনা জানেন—জীবিতদের মধ্যে তাঁদের সংখ্যা কমে আসছে দিন দিন। ভয় পাচ্ছি, গবেষণার যথার্থ উপাদানগুলি হারিয়ে যাবে একদিন সম্পূর্ণ রূপে। সব হারিয়ে যাবার আগে তাঁর কিছুটা এখনই সংগ্রহ করে রাখা ভালো নয় কি! তারপরে তো হা-হুতোশ করা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

জানি না, আমাদের নিম্ন কণ্ঠস্বর অত উঁচুতে গিয়ে পৌছুবে কি না!

বাইশে শ্রাবণ

নাট্যকার মন্মথ রায়

(শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশ রচিত 'বাইশে শ্রাবণ' অবলম্বনে)

[শান্তিনিকেতনে 'উদয়ন'। জুলাই, ১৯৪১। রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা দেবী এবং শ্রীপ্রশান্তকুমার মহলানবীশের স্ত্রী শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশ (রাণী)]

প্রতিমা ॥ প্রশান্ত বর্ধমান স্টেশন থেকে ফোন করে জানালেন, গিরিডি থেকে তোমরা সোজা মোটরে চলে আসছ শান্তিনিকেতনে। শুনে বাবা মশাই খুশীই হয়েছেন।

নির্মলকুমারী ॥ এখন কেমন আছেন? রথীন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে কি দুশ্চিন্তা নিয়ে যে আমরা ছুটে এসেছি, বুঝতেই পারছো।

প্রতিমা ॥ দুশ্চিন্তারই কথা। এনলার্জড্ প্রস্টেট, অপারেশন ছাড়া গতি আছে মনে হয় না, ডাক্তাররাও আর দেরী করতে চাইছেন না। জ্বরটা কমাবার চেষ্টা হচ্ছে। জ্বর ছাড়লেই অপারেশনের দিন স্থির হবে।

নির্মল ॥ জ্বর কত?

প্রতিমা ॥ জ্বর ১০০ ডিগ্রীর নীচে নামে না, আর প্রায় ১০১ ডিগ্রী পর্যন্ত ওঠে। মুখে মোটে রুচি নেই। খেতে পারেন না বলে খুব দুর্বল হয়ে পড়ছেন। নাতনী নন্দিতাকে ধরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। গাছ-পালা-বাড়ীঘর সব এত প্রিয়, নিজ চোখে একটি বার না দেখলে শান্তি পান না।

নির্মল ॥ কাপড়টা পাল্টে অধ্যাপককে নিয়ে আমরা ওখানে গিয়েই প্রণাম করছি।

প্রতিমা ॥ এস। তোমরা দু'জন আসাতে বাবা মশাই শুধু খুব খুশী হবেন না —সাহসও পাবেন অনেক। স্বর্গীয় কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতির পুত্র বিমলানন্দ তর্কতীর্থকে নিয়ে আজ ডাক্তার রায় অধিকারী এসে গেছেন। ওঁরা এখানে আসবেন বলেই আমি অপেক্ষা করছি।

নির্মল ॥ কবিরাজী চিকিৎসা হবে বুঝি ?

প্রতিমা ॥ তা এখনও কিছু ঠিক হয়নি। কিন্তু বাবা মশাইয়ের খুব ইচ্ছা, কবিরাজী চিকিৎসায় যদি অপারেশনটা এড়ানো যায়।

নির্মল ॥ আমি আসছি। ঐ ওরাও বোধ হয় এখানে আসছেন।

(নির্মলকুমারীর প্রস্থান, ডাঃ রাম অধিকারী এবং কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থকে অভ্যর্থনা করে এনে বসালেন প্রতিমা দেবী)

ডাঃ রাম ॥ (প্রতিমা দেবীকে) আমরা দেরী করে ফেলেছি কি ? সকাল-বেলায় কিন্তু গুরুদেব আমাদের ঠিক এই সময়েই আসতে বলেছিলেন।

প্রতিমা ॥ না না, দেরী হয় নি। বাবা মশাই বারান্দায় পায়চারী করছেন।

ডাঃ রাম ॥ তা বেশ তো, আমরা বসছি।

প্রতিমা ॥ এবার দেখে কি বুঝলেন ডাক্তার অধিকারী ?

ডাঃ রাম ॥ এত অল্প সময়ের মধ্যে চেহারাটা বেশ খারাপ হয়ে গেছে। কপালে গভীর রেখা দেখা দিয়েছে, গালের চামড়া কুঁচকে গেছে।

বিমলানন্দ ॥ এমন রুগ্ন চেহারা দেখব আশা করিনি। বৃদ্ধ হলেও বার্ধক্যের ছাপ ওঁর চেহারায় ছিল না। এই প্রথম সেটা দেখলাম।

প্রতিমা ॥ চুপ, ওই যে আসছেন। (রবীন্দ্রনাথ নন্দিতা ও নির্মলকুমারীর কাঁধে ভর দিয়ে এখানে এসে দাঁড়ালেন।)

রবীন্দ্রনাথ ॥ এমন দু'টি স্তম্ভ থাকলে আর যে-ই ভেঙে পড়ুক, রবি ঠাকুর ভেঙে পড়বে না কোন দিন। (সকলে হেসে উঠলেন) (বিমলানন্দকে) দেখো হে, তোমরা আমায় কিছু করতে পারো কিনা। ছেলেবেলা থেকে আমার শরীরে কোনো অস্ত্রাঘাত হয় নি ; শেষকালে কি যাবার সময় আমাকে ছেঁড়াখোঁড়া করে দেবে ?

বিমলানন্দ ॥ দেখুন, এমনি আমি আপনাকে কিছু আশা দিচ্ছি না। আমি আগে এক সপ্তাহ ধরে সব রকম পরীক্ষা করে দেখতে চাই কোন দিক দিয়ে চিকিৎসা করলে সব থেকে উপকার হবার সম্ভাবনা। আমার অনেক কিছু জানবার আছে—অনেক কিছু দেখবার আছে।

রবীন্দ্রনাথ ॥ ওরে বাবা ! (মেয়েদের প্রতি) আচ্ছা, তাহলে তোমরা এখন এসো।

বিমলানন্দ ॥ না-না, ওঁরা থাকুন না।

প্রতিমা ॥ (রামবাবুকে) আমরা কাছেই থাকব, দরকার হলেই ডাকবেন।
(মহিলাদ্বয়ের প্রস্থান)

বিমলানন্দ ॥ (রবীন্দ্রনাথের নাড়ী পরীক্ষা করে) তবে আপনার নাড়ী খুব ভালো দেখছি। আমার তো খুবই আশা যে আপনার উপকার আমি করতে পারবো। এ রকম রোগের চিকিৎসা আগেও করেছি ; আমার খুবই বিশ্বাস যে, অস্ত্রাঘাত থেকে আপনাকে বাঁচানো যাবে। এ রোগ অবশ্য সম্পূর্ণ সারে না, তবে এতটা কমিয়ে দেওয়া যায় যাতে শরীরের গ্লানি চলে যাবে, জ্বর থাকবে না, খিদে হবে।

রবীন্দ্রনাথ ॥ তা হ'লেই হ'ল। এই বয়সে আমি তো আর লাফালাফি করতে চাচ্ছি না ; শুধু শরীরের গ্লানিটা একটু কম থাকে এবং আগের মতো নিজের শরীরটাকে নিজেই চালনা করতে পারি, এখনকার মতো সম্পূর্ণ পরের উপর নির্ভর না করতে হয়, তা হ'লেই আমার চলে। হাতের আঙুল-টাঙুলগুলো আড়ষ্ট হয়ে গেছে, লিখতে পারি না আজকাল ; এটুকু পেলেও তো অনেকখানি। (রামবাবুর দিকে ফিরে) এই এঁরা বলেন অপারেশন ছাড়া আমার আর গতি নেই। এই ব্যামোর বিষটা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে বলেই আমার শরীরের আজ এই অবস্থা। অথচ তুমি বললে আমার নাড়ী খুব ভালো, ওষুধেই ভালো হবার আশা তুমি করছো। কার কথা মানি বলো ? আমারও তো কিছুতেই মনে নিচ্ছে না যে ওষুধে এর চিকিৎসা নেই।

রামবাবু ॥ না, গুরুদেব, আমরা তো বলছি যে, এখনি আপনার এমন কিছু হয়নি, যাতে এক্ষুনি অপারেশন করবার দরকার আছে। না, গুরুদেব, আমি অন্যায় করেছি, আপনাকে সেদিন অপারেশনের কথাটা বলে। বুঝতে পারছি আপনি আমার কথায় অত্যন্ত ব্যথা পেয়েছেন। আমি ক্ষমা চাচ্ছি সে জন্য। আর আপনার কাছে ও কথা তুলবো না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কবিরাজ মশাই যেটা বলছেন সেটা তো খুবই আশার কথা। এঁরা খুবই যখন নিশ্চিত যে, আপনাকে সারিয়ে তুলতে পারবেন, তখন তো আর কথাই নেই। আর আমরাও তো তাতে খুশীই হব। আচ্ছা, আপনি এখন বিশ্রাম করুন, আমরা উঠছি।

রবীন্দ্রনাথ ॥ তা হ'লে কবিরাজীই সুরু হোক।

বিমলানন্দ ॥ (হেসে) কবিদের মধ্যে যিনি রাজা, তাঁর আর কোন চিকিৎসা শোভা পায় না গুরুদেব। (তিন জনেরই উচ্চ হাস্য)

(কালক্ষেপক অন্ধকার অন্তে দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে রয়েছেন। নন্দিতা খল-এ করে' কবিরাজী ওষুধ দিলেন, কবি খেলেন। তারপর জল খেলেন। নির্মলকুমারী একটি তোয়ালে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মুখ মুছে দিলেন।)

রবীন্দ্রনাথ ॥ ওষুধটা খেতে এমন কিছু বিস্বাদ নয়।

নির্মলকুমারী ॥ নিমপাতার সরবৎ যিনি খেতে ভালবাসেন, তাঁর কাছে কোন ওষুধই বিস্বাদ হবার কথা নয়!

নন্দিতা ॥ এত দিন তো কবিরাজ মশাই নান রকম ওষুধ দিয়ে রাস্তা খুঁজছিলেন। এবার মনে হচ্ছে, রাস্তা পেয়ে প্রথমেই যে ওষুধ দিয়েছেন তাতেই কিন্তু খুব উপকার দেখছি। টেমপারেচার আজ ৯৮·৬ ডিগ্রী, নাড়ী ১০৬।১১০ থেকে ৯৮তে নেমে গেছে। চার্টের খাতায় দেখছি জলীয় পান ২২ আউন্স, আর ১১ বারেই আউটপুট ৪৪ আউন্স। অন্য দিনের তুলনায় এটা আশ্চর্য বেশী।

রবীন্দ্রনাথ ॥ কিন্তু রথীরা এই চিকিৎসায় খুশী নন। বিধান রায়েরা নাকি এক মাসের মধ্যে ক্রাইসিস আশংকা করছেন। তখন সেই অপারেশন করেও পার পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। রথী বারবার বলছিলেন একথা। তা আমি কাল তাকে ডেকে বলেছি, করতে হয়তো চুকিয়ে দে, আর টাঙিয়ে রেখে লাভ কি। ওরা তাতে বলেছেন, আর এক মাস দেখবেন। তার মধ্যে যথেষ্ট উপকার না দেখতে পেলে, অপারেশন করতেই হবে। কবিরাজ মশাইকে ডেকে বলেছি, এক মাস মোটে সময়, এর মধ্যে যেমন ক'রে পারো লেগে আমাকে অস্ত্রাঘাত থেকে রক্ষা করো। (ক্ষণিক নিস্তব্ধতার পর নির্মলকুমারীকে) দেখো রাণী, আমি কবি—আমি সুন্দরের উপাসক। বিধাতা আমার এই দেহখানা সুন্দর করে গড়েছিলেন। এখান থেকে বিদায় নেবার সময়, এই দেহখানা তেমনি সুন্দর অবস্থাতেই ফিরিয়ে দিতে চাই। গাছ থেকে শুকনো পাতা যেমন আপনি ঝ'রে যায়, আমারও ঠিক তেমনি ভাবেই সহজে বিদায় নেবার ইচ্ছা

চিরকাল। কেন এরা যাবার আগে আমাকে ছেঁড়াগোঁড়া করে দিতে চাচ্ছে? বয়স তো ঢের হয়েছে, আর কতদিনই বা মানুষ বাঁচে, কাজেই ছেড়ে দিক্ না আমাকে। ফুলের মতো, ফলের মতো, শুকনো পাতার মতো আমার স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি ঘটুক।

নন্দিতা॥ এ সব কথা এখন থাক। (নন্দিতার প্রস্থান)

রবীন্দ্রনাথ॥ বোধ করি চালকুমড়োর পায়েস আনতে চললেন। ওতে খুব উৎসাহ। তুমিও তো তোমার সেই অসুখের সময় এই কবিরাজী পথ্য খেয়েই বেশ গোল-গাল হয়ে' উঠেছিলে, কি গো?

নির্মলকুমারী॥ সত্যিই ওটা ভালো জিনিষ। খেয়ে আমার খুব উপকার হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ॥ তাতেই বুঝি মুখখানা পূর্ণচন্দ্রের মত হ'য়ে উঠেছে! (দু'জনেই হেসে উঠলেন) জানো, তোমরা মেয়েরা যখন কাছে থেকে শুশ্রূষা করো তাতে একটু বেশী পাই সান্ত্বনা। বয়স বেশী হ'লে মনটা যে শিশু হয় তা এখন বুঝতে পারি, কারণ মায়ের স্নেহ পেতে ইচ্ছে করে। আজকাল আমার মামণিকে যে 'মা' বলে ডাকি সেটার প্রয়োজন হয়। ওঁকে এখন সত্যিই আমার মা মনে হয়। উনি যখন কোনো কারণে শান্তিনিকেতন থেকে যান আর আমি এখানে পড়ে থাকি, নিজেকে তখন মাতৃহীন অসহায় মনে করি। আমি ওকে বলেছি, নানা কাজে রথীকে আমার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে হয়, কিন্তু মা, তুমি যেও না।

নির্মলকুমারী॥ আমাকে বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ॥ কি বলেছেন?

নির্মলকুমারী॥ বাবা মশায় এ কথা না বললেও আমি যেতাম না।

রবীন্দ্রনাথ॥ এই স্নেহ—এই মমতা, এই অসুখের একটি পরম দান। ইউরোপে যখন গিয়েছি তখন দেশে দেশে রাজার মতো সমাদর সম্মান পেয়েছি। সেও আমার জীবনের একটা আশ্চর্য পর্যায়। শুধু যে সম্মানই পেয়েছি তা নয়, ভালবাসাও পেয়েছি গভীর। তারা আমার মধ্যে কী দেখেছে জানি না কিন্তু জনসাধারণ আমাকে গভীরভাবে ভালোবেসেছে। তোমরা তো সঙ্গে ছিলে, দেখেছো, জার্মানী ও অন্যান্য জায়গায় আমাকে তারা কী সম্মান কী অভ্যর্থনা দিয়েছে।

ঐ সব বড়ো বড়ো জাত যারা আজকের দিনে নিজেদের মধ্যে হানাহানি করছে, তারা আমার মুখের কথা কি রকম নম্র হয়ে শুনেছে। এ সবই আমার কাছে আশ্চর্য মনে হয়। তবু আজকাল থেকে থেকে সেই পদ্মার চরের মধ্যে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে—সেই সহজ, সুন্দর, মধুর জীবন যাত্রায়।

নির্মলকুমারী ।। (হেসে) তা বেশ তো—কিন্তু যদি এখন কেউ এসে বলে—রবীন্দ্রনাথ, তোমার এই দণ্ড মুকুট খসিয়ে নিয়ে যদি তোমাকে সেই অখ্যাত দিন গুলি ফিরিয়ে দিয়ে যাই, রাজী আছ? তখন কি হবে মশাঁই?

রবীন্দ্রনাথ ।। তখন নিশ্চয়ই বলবো 'না'। কারণ এই দায় ভার, এ সবের কোনো মোহ নেই একথা বললে মিথ্যা বলা হবে। তার মানে এটাও চাই ওটাও চাই। মানুষের মন কি মজার তাই দেখো। তবু এ কথা খুবই সত্যি যে, এই সম্মান খ্যাতির মধ্যে দিয়ে মানুষের যে ভালোবাসাটা পেয়েছি, সেইটাই সবচেয়ে বেশী মনকে স্পর্শ করেছে। আমার জীবনে এইটাই বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান।

নির্মলকুমারী ।। আর একদিন আপনি বলেছিলেন—বিদেশের নানা জাতির, নানা মানুষের কাছ থেকে যে অজস্র ভালোবাসা পেয়েছিলেন, তাতে করেই 'বিশ্বভারতী'র ভাবটা আপনার মনে দানা বেঁধে উঠেছিল।

রবীন্দ্রনাথ ।। হ্যাঁ, তাতেই স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারলুম যে, মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা কোনো জাত বা দেশের বাঁধা মানে না। তাই মনে হ'ল, আমার আশ্রমে এমন একটি জায়গা তৈরী করবো, যেখানে সব দেশ সব জাতের লোক এসে সহজেই বন্ধুর মতো পরস্পরের সঙ্গে মিলতে পারবে—এই রকম একটা আবহাওয়ার মধ্যে পৃথিবীর আজকের দিনের অনেক সমস্যা সহজ হয়ে যাবে। (প্রতিমা দেবীর প্রবেশ) এই যে মা-মণি, রথী ক'লকাতায় চলে গেল?

প্রতিমা ।। হ্যাঁ। এখন কেমন বোধ করছেন?

রবীন্দ্রনাথ ।। বেশ ভালো। ক'লকাতা রওনা হওয়ার আগে রথী দেখা

ক'রে গেছে। ওকে আবার আমি স্মরণ করিয়ে দিয়েছি কবিরাজ খুবই আশা করছেন, তাঁর ওষুধেই আমাকে ভালো ক'রে তুলবেন। তবে একটু সময় লাগবে। আঃ! বাঁচি, যদি কাটা ছেঁড়া না করতে হয়। তা দেখলুম, রথী কিছু না বলেই চলে গেল। তার মানে— বুঝেছ?

প্রতিমা।। না না, আপনি খামোকা অপারেশনের কথা ভাবছেন কেন, যখন কবিরাজী চিকিৎসার ফল বোঝা যাচ্ছে।

নির্মলকুমারী।। ও সব কথা এখন থাক। দেখ প্রতিমাদি, কি আশ্চর্য কাণ্ড! কাল রাত দেড়টার সময় হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, জেগে কি বলছেন। খাটের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই শুনি, গড়গড় ক'রে একটা কবিতা ব'লে যাচ্ছেন—তখনই মুখে মুখে রচনা—আমি তাড়াতাড়ি জ্বর লেখবার খাতাটা আর পেন্সিল নিয়ে বসে ঐ লণ্ঠনের আলোয় যতটা পারি টুক্‌রো টুক্‌রো লাইন লিখে নিলাম। একে ঘুমে জড়ানো কথা—তার উপরে অত তাড়াতাড়ি স্রোতের মতো ব'লে যাওয়া—তাই সবটা লিখতে পারলাম না।

রবীন্দ্রনাথ।। আজ ভোরে ওটা পূর্ণ করেছি। আমি কি আর আজকাল লিখতে পারি! বিধাতা আমার সব শক্তি হরণ করেছেন। গানের গলা দিয়েছিলেন, আজ আর কোন মতে গলা দিয়ে যেন স্বর বেরোয় না। আগে কতো অজস্র লিখেছি, আর আজ অতি কষ্টে এই ক'টা লাইন লিখলুম—

বহু লোক এসেছিল জীবনের প্রথম প্রভাতে
কেহ বা খেলার সাথী, কেহ কৌতূহলী,
কেহ কাজে সঙ্গ দিতে, কেহ দিতে বাঁধা।
আজ যারা কাছে আছ এ নিঃস্ব প্রহরে,
পরিশ্রান্ত প্রদোষের অবসন্ন নিস্তেজ আলোয়
তোমরা আপন দীপ আনিয়াছ হাতে,
খেলা ছাড়িবার আগে তীরের বিদায়-স্পর্শ দিতে।
তোমরা পথিক বন্ধু,
যেমন রাত্রির তারা
অন্ধকারে লুপ্ত পথ যাত্রীর শেষের ক্লিষ্ট ক্ষণে।।

(কালক্ষেপক অন্ধকার অন্তে দেখা গেল, বাতায়ন পার্শ্বে দণ্ডায়মান রবীন্দ্রনাথ। ক্লান্ত এবং অবসন্ন)

রবীন্দ্রনাথ ।। 'আনন্দরূপমমৃতম্ সদ্বিভাতি'—'আনন্দরূপমমৃতম্ সদ্বিভাতি'—কিন্তু গোড়াকার কথাটা কি ? 'আনন্দরূপমমৃতম্ সদ্বিভাতি'—কিন্তু এর আগের কথাটা কি ? কিছুতেই মনে করতে পারছি না ! ওরে, এ আমার কি হ'ল ? (হাতে এক গুচ্ছ বেল ফুল নিয়ে নির্মলকুমারীর প্রবেশ) ওরে রাণী, 'আনন্দরূপমমৃতম্ সদ্বিভাতি'-র গোড়াকার কথাটা কি ?

নির্মলকুমারী ।। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'।

রবীন্দ্রনাথ ।। ঠিক ঠিক। সকাল থেকে এটা কিছুতেই মনে করতে পারছি নে। আচ্ছা, আমার প্রতিদিনকার ধ্যানের মন্ত্র কী করে এ রকম ভুলে যাওয়া সম্ভব হ'ল ? 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতম্ সদ্বিভাতি'।

(বলতে বলতে রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন। প্রতিমা দেবীর প্রবেশ)

প্রতিমা। ডাক্তার বিধান রায় দলবল নিয়ে বিদায় নিলেন।

নির্মলকুমারী ।। গুরুদেব সব জেনেছেন ?

প্রতিমা ।। হ্যাঁ, রাণী। বাবা মশাই যতই বলছিলেন, কেন ? আমি তো আজকাল আগের চেয়ে বেশী খাচ্ছি—আস্তে আস্তে তাইতেই তো শরীরে জোর পাব। তা' বিধানবাবু মানলেন না, বললেন—শুধু তো খাওয়া না, আরও তো নানান রকম উপসর্গ আছে। এ তো কিছু শক্ত অপারেশন নয়, ওটা করিয়ে ফেলাই ভালো। তাতে দেখবেন আপনার শরীরের সব কষ্ট গ্লানি, এখন যা অনুভব করছেন চলে যাবে। বাবা মশাই আর কিছু বললেন না। বিধানবাবুর কথার উপর আর বলবেনই বা কি ! শুধু অত বড় ডাক্তারই তো নন, অতবড় ভক্তও তো বটে। কি জানি ভাই, আমার কিন্তু ভালো ঠেক্‌ছে না।

নির্মলকুমারী ।। রথীন্দ্রনাথ কি বলছেন ?

প্রতিমা ।। তাঁর ডাক্তার বন্ধুদের মতে এখনও সময় থাকতে অপারেশনটা করিয়ে ফেললে কবির মাথাটাকে বাঁচানো যাবে। আরও বহুদিন উনি সাহিত্যের ভাণ্ডারে অনেক রত্ন যোগাতে পারবেন। এখন

রোগের বিষটা শরীর থেকে বেরোতে পারছে না। তাই মাথাটা আগের চেয়ে ঝাপসা হয়ে আসছে।

নির্মলকুমারী ।। মাথাটা আগের চেয়ে সত্যিই ঝাপসা হয়ে আসছে। জানো প্রতিমাদি, নিত্য ধ্যানের মন্ত্রটিও আজ ভুলে গিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ। কণ্ঠে তাঁর ধ্যানের মন্ত্র। মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে এসে আরাম কেদারায় বসে পড়লেন। প্রতিমা ও নির্মলকুমারী সাহায্য করলেন। প্রতিমা দেবী রবীন্দ্রনাথের হাত টিপে দিতে লাগলেন।

রবীন্দ্রনাথ। (আর্তকণ্ঠে) মা-মণি, সব ঠিক হয়ে গেছে। এরা আমাকে কাটাবেই, কিছুতেই ছাড়বে না।

(কবির চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ল। প্রতিমা দেবী কবির গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

রবীন্দ্রনাথ ।। আর ক'দিনই বা বাকি আছে? এই ক'টা দিন দিক না আমাকে যেমন আছি তেমনি করে থাকতে। কোনোদিন তো আমাকে যেতেই হবে। কিন্তু আমি কবি। আমার ইচ্ছে কবির মতনই যেতে—সহজে এই পৃথিবী থেকে ঝরে পড়তে চাই শুকনো পাতার মতো। যাবার আগে আমাকে নিয়ে এই টানাছেঁড়া কেন? আসলে যাবার আগে ঐ 'ছেঁড়াখোঁড়া' হয়ে যাবার কল্পনাটাই মনকে কষ্ট দিচ্ছে। কবির এই কষ্ট পাওয়াটা দেখতে ভালো লাগছে না।

(রবীন্দ্রনাথ অশ্রু সম্বরণ করতে পারলেন না। পার্শ্বচর প্রাণী দু'টিও পারলেন না)

(কালক্ষেপক অন্ধকার অন্তে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। ৩০শে জুলাই, ১৯৪১। নন্দিতা দেবী কবিকে পথ্য খাওয়ালেন। কবি খেতে গিয়ে নির্মলকুমারীর দিকে চেয়ে বললেন—)

রবীন্দ্রনাথ। না না, তুমি তো আর খাচ্ছ না, তুমি থামছ কেন? আমি চালিয়ে যাচ্ছি, তুমিও চালিয়ে যাও।

নির্মলকুমারী ।। (কবির সদ্য সমাপ্ত কবিতাটি পড়তে লাগলেন)

"দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে ;
এক মাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু

কষ্টের বিকৃত ভাণ, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার।"...

রবীন্দ্রনাথ।। কী কাণ্ড! ক'লকাতা আসার পরও দুটো কবিতা হয়ে গেল। এটা পাগলামী না তো কী? এর কী কোন শেষ নেই? শেষ ব্যাপারটা কবে হচ্ছে, জানো তো বল না।

নির্মলকুমারী।। শুনলাম, এই কাল কি পরশু। এখনও ঠিক হয় নি।

নন্দিতা।। ললিতবাবু—মানে, সার্জন ললিত ব্যানার্জী যে দিন ভালো বুঝবেন, সেই দিনই হবে।

রবীন্দ্রনাথ।। এত সব লুকোছুপির দরকার কি রে বাপু? অনিশ্চিতের চেয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানলে—তা সে যত বড় বিপদই হোক্, লড়াই-এর জন্য তৈরি থাকা যায়। ওরে, আজকের কাগজে যুদ্ধের খবরটা জানো তো?

নির্মলকুমারী।। হ্যাঁ, একটু যেন ভালো খবর। আজকের কাগজ পড়ে তো মনে হচ্ছে যে, রাশিয়ান সৈন্য জার্মানদের একটু ঠেকাতে পেরেছে।

নন্দিতা।। এটা বোঝা যাচ্ছে, জার্মানরা অত তাড়াতাড়ি আর এগোতে পারছে না।

রবীন্দ্রনাথ।। (খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে) পারবে, পারবে, রাশিয়ানরা পারবে। ভারি অহংকার হয়েছে হিটলারের। গোয়েরিং, গোয়েরিং—এখন দেখুক গোয়েরিং, কী হয়! দুশমনরা!

নন্দিতা।। রাশিয়ানরা সত্যই খুবই বীরত্ব দেখাচ্ছে, অসম্ভব লড়ছে।

রবীন্দ্রনাথ।। ওরে, লড়ছি আমিও। কিন্তু আমার রসদ যোগাবে যে, আমার সেই মা-মণি বেশি অসুখ হয়ে পড়ে রয়েছে শান্তি-নিকেতনে।

নন্দিতা।। কিন্তু আজ তাঁর যে চিঠি এসেছে, তাতে কিন্তু তিনি লিখেছেন, তাঁর মন পড়ে রয়েছে এখানে—খুবই ভাবনায় আছেন আপনার জন্য। ভারি উতলা হয়ে উঠেছেন এখানে আসবার জন্য। চিঠিটা আমি আনছি। (প্রস্থান)

রবীন্দ্রনাথ।। এলে ভালো লাগতো। কিন্তু পারবে কি? দেহের যা অবস্থা, তাতে উচিত হবে কি? না না, যখন সময় হবে, আসবে। এসেছি সংসারে, মিলেচি, তারপরে আবার কালের টানে সরে যেতে হয়েচে। এমন কত বারবার হল, বারবার হবে—এর সুখ

এর কষ্ট নিয়েই জীবনটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠচে। যতবার যত ফাঁক হোক আমার সংসারে, বৃহৎ সংসারটা রয়েছে, সে চলচে, অবিচলিত মনে তার যাত্রা মেলাতে হবে।

(নত-বিষন্ন মুখে নন্দিতার পুনঃ প্রবেশ)

নন্দিতা ॥ ললিতবাবু এসে গেছেন। পূবের বারান্দায় সব কিছু আয়োজন প্রস্তুত।

রবীন্দ্রনাথ ॥ আজই—?

নন্দিতা ॥ এখনই। আপনাকে ষ্ট্রেচারে ক'রে বারান্দায় নেবার জন্য ব্যবস্থা হয়েছে। ললিতবাবু নিজে আপনাকে নিতে আসছেন।

রবীন্দ্রনাথ ॥ ঘণ্টা বেজেছে। 'সৃষ্টি লীলা প্রাঙ্গণের প্রান্তে দাঁড়াইয়া'— তোদের মুখস্থ থাকে তো বল্—আমি শুনে যাই—

নির্মলকুমারী ॥ "সৃষ্টি লীলা প্রাঙ্গণের প্রান্তে দাঁড়াইয়া
দেখি ক্ষণে ক্ষণে
তমসের পরপার,
যেথা মহা-অব্যক্তের অসীম চৈতন্যে ছিনু লীন।"...

(কালক্ষেপক অন্ধকারে ঘোষকের কণ্ঠ শোনা গেল—)

ঘোষক ॥ ১৯৪১ সালের ৩০শে জুলাই তদানীন্তন সুবিখ্যাত সার্জন ডক্টর ললিত ব্যানার্জী কবির দেহে অস্ত্রোপচার করেন। কিন্তু অভিপ্রেত সুফল পাওয়া গেল না। ৭ই আগষ্ট তারিখে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বিশ্বরবি অস্তমিত হ'ল। সেদিন ছিল ২২শে শ্রাবণ। এই শ্রাবণ সন্ধ্যাটির জন্যই বুঝি তিনি রচনা ক'রে রেখেছিলেন তাঁর শেষ কামনা—শেষ প্রার্থনা—সেই মহাসংগীত—

"সমুখে শান্তি পারাবার
ভাসাও তরণী, হে কর্ণধার।"

॥ য ব নি কা ॥

গোপাল বিরচিত

কয়েক বছর আগের কথা। ঝোলাটা কাঁধে ফেলে পৌষ মেলায় পৌছেছিলুম শান্তিনিকেতন। স্টেশন থেকে সুরু করে বিশ্বভারতী পর্যন্ত শুধু মানুষের সারি। মেলা-প্রাংগণ লোকে লোকারণ্য। দেহাতী থেকে সুরু করে আলিপুরের আধুনিকা—সবাই আছে। নতুন জায়গায় মেলা বসে আজকাল। চারদিকে পিচ্ ঢাকা প্রশস্ত রাজপথ। কলেজ জীবনে এসেছিলুম একবার শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায়। সেবার কিন্তু চার পাশের পরিবেশ মিলে একটা শান্তিনিকেতনী আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল। তরুবীথির তলে বসা আগের মেলার রূপ প্রত্যক্ষ করতে পারলুম না এবার। এত হিপির আসরও আগেরবার চোখে পড়েনি।

ঘুরতে ঘুরতে এলুম 'কবিতার দোকান' এর সামনে। শান্তিনিকেতন—বিশ্বভারতীর ছেলে মেয়েরা এক টাকা বা দু' টাকার বিনিময়ে ক্রেতার পছন্দ মাফিক কবিতা তৈরী করে দিচ্ছে। জিনিষটা অভিনব সন্দেহ নেই। অনেককেই আকর্ষণ করছে। তেল চুক্ চুক্ টেরী কাটা চুল, সাদা গিলে করা ধবধবে পাঞ্জাবী গায়ে, শরীরের রং আবলুষ কাঠকেও হার মানায়, গোলগাল চেহারার একটি লোক দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। পানের ছোপ ধরা মাড়ি বের করে বলল—মশায়, আমার নাম শ্রীহরিপদ হালদার, পিতা ঈশ্বর নরহরি হালদার, পেশা কোলকাতায় ঝোলাগুরের ব্যবসা। আমার নামে জব্বর এক খানি ছড়া তৈরী করে দিন দিকি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তৈরী হয়ে গেল কবিতা। আমার দিকে তাকিয়ে 'ঝোলাগুর' বল্লে—চুপ্ চাপ্ দাঁড়িয়ে কেন স্যার। আপনিও নেন্ এক খানি তৈরী করে। তারপর একটু সন্ধিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে বলল—অবিশ্যি মনে হচ্ছে আপনি নিজেই ছড়া-টড়া লেখেন—হো—হো···হো। নিজেই হাসতে থাকে হরিপদ হালদার।

ভালো লাগছিল না। আরো কিছুটা ঘুরে ক্লান্ত হয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসেছিলুম। হাঁটতে হাঁটতে কখন কোপাই-এর ধারে চলে এসেছি নিজেই জানি না। মরা কোপাই। তবু নিরিবিলিতে বসে ভালো লাগছিল। ভাবছিলুম, গুরুদেবের সময়কার আশ্রম শান্তিনিকেতনের রূপটি।

—বাবু মশয়! চম্‌কে উঠলুম কার ডাকে। ফিরে তাকিয়ে দেখি একটি গ্রাম্য বৃদ্ধ কখন আমার পিছনে একটু দূরে এসে বসেছে। আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে বললে—বাবু মশয়! এত আনন্দ আর হুল্লোড় ফেলে ফাঁকা জায়গায় চুপ্‌চাপ বসে কেন?

প্রথমটায় বুঝতে পারছিলুম না। শহুরে মানুষ, সবটাতেই সন্দেহ করা অভ্যেস। বল্‌লুম—এমনি। তুমি কি চাও?

—কিছু না বাবু মশয়। মনে হোল আমার মত আপনারও ভালো লাগেনি ঐ সব রং-তামাশা। তামাশাই বলবো। কি ছেল আর কি হোল! দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল বৃদ্ধ।

আমি উৎসুক হয়ে উঠলুম। বল্‌লুম—তুমি কিছু বলবে?

আমার কথায় সাড়া দিয়ে বৃদ্ধ সেদিন অনেক না-জানা কথা বলেছিল। কাছেই একটি গ্রামের অধিবাসী সাত্যকি দলুই। কবিগুরুর জীবদ্দশাতেই আশ্রমে যাতায়াত। মালীর কাজ করত। খুব কাছ থেকে দেখেছে মানুষ রবীন্দ্রনাথকে। সব শেষে বলেছিল—কত্তা বাবা থাকতে আশ্রমের কি রূপ ছেল জানেন। ঠিক য্যান তপোবন। আমার মনে আছে বাবু মশয়, একদিন নিড়েন দিতে গিয়ে একটি চাড়া গাছ উপড়ে ফেলেছিলম গো। ওঃ ঠিক কত্তা বাবার চোখটি পড়ে গ্যাছে। কাছে পিঠেই কোথায় ছেলেন বুঝি। ছুটে এসে বললেন—সাত্যকি, একটা প্রাণী হত্যা করলি? আমি তো মরমে মরে গেলুম গো। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে আবার বল্‌লে বৃদ্ধ—তারপর কত্তা বাবা দেহ রাখলেন। আশ্রমের চেহারা ধীরে ধীরে পাল্টে গেল। তারপর যখন গাছ পালা কেটে পীচের সড়ক হতে লাগল, আমি চাকরি ছেড়ে দিলম বাবু মশয়। পারলাম না আর পোড়া চোখে দেখতে। এখন শুধু ফি-বছর একবারটি আসি। আর আস্‌বো না বাবু মশয়।

আমি বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে তাকিয়েছিলুম সাত্যকি দলুইয়ের দিকে। সাধারণ একটি গ্রাম্য অশিক্ষিত মানুষের মাঝে গুরুদেবের কি বিরাট প্রভাব!

ফিরবার পথে আবার দেখা 'ঝোলাগুর' এর সংগে। দাঁত বের করে বল্‌লে—হেঁ, হেঁ, জব্বর ছড়াটি তৈরী করেছে স্যার। ছোকরার এলেম আছে বটে! তা' স্যার, আপনি এসব ফেলে বনবাদারে ঘুরে মরছেন?

কোনো জবাব না দিয়ে ধীরে ধীরে স্টেশনের দিকে পা বাড়িয়ে ছিলুম।

লাল-নহলা

সত্যগোপাল বসু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[পূর্বাভাষ—গোয়েন্দা একলব্য নন্দী তার বন্ধু নির্মালা মল্লিকের আমন্ত্রণে ঝাঝার নবনির্মিত বাংলোয় কয়েকদিনের ছুটী কাটাতে যাচ্ছিল। সাথে সহকর্মী সাধন। ট্রেনে অপর সহযাত্রী সুন্দরী যুবতী বসুমিতার আচরণ খুবই রহস্যময়। বসুমিতা চিত্তরঞ্জনে নেমে যায়। গোপন সংবাদ পেয়ে পুলিশ ভুল করে কারমাটারে একলব্যকে ঐ কামরায় পাওয়া একটি ট্রাংক সহ গ্রেপ্তার করে। ট্রাংকে ছিল মৃতদেহের বিভিন্ন কাটা অংগ। পূর্ব পরিচিত ইন্সপেক্টর লোকনাথ ঝার সহায়তায় একলব্য মুক্তি পায়। ট্রাংকের ভিতর 'লাল-নহলা' লেখা কার্ড থেকে বোঝা যায় একলব্যকে ফাঁদে ফেলবার পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। সাধনকে নিয়ে ঝাঝায় পৌঁছে একলব্য জানতে পারে—নির্মাল্য খুন হয়েছে, পড়ে থাকা কার্ডে লেখা 'প্রথম বলি—লাল-নহলা'। কলকাতায় ফিরে এসে সি-আই-ডি'র ভবেন মজুমদারের সাথে দেখা করে এবং জানতে পারে বসুমিতার কাছ থেকে জানা ফোন নম্বর হচ্ছে খিদিরপুর ডক অঞ্চলের হোটেল 'মধুপ্রিয়া'-র।]

একলব্য বলে, 'মধুপ্রিয়া'র সম্বন্ধে কিছু খোঁজ করেছো ?

—ওখানকার ককটেলের খুব নাম আছে। নাবিকদের ভীড় বেশী। এ ছাড়া আছে ক্যাবারে ও কল গার্লের চোখ ঝলসানো চমক। যে কোনো দিন রাত দশটার পরে গিয়ে দেখো, শুধু ভারতের কেন—বিশ্বের প্রায় সকল দেশের মানুষ সেখানে ভীড় জমিয়েছে।

—'মধুপ্রিয়া'র প্রোপ্রাইটার কে ?

—তুমি চেনো। খুবলাল খোসলা।

—খুবলাল ! কি মনে করে একলব্য চমকে ওঠে। চোখের সামনে

থেকে কালো পর্দা ধীরে ধীরে সরে যায়। বলে, হাঁা, মনে পড়েছে মজুমদার। আর সেই সাথে মনে পড়েছে তোমাদের সেই 'চতুরঙ্গ ষড়যন্ত্র' মামলার কথা।

ভবেন নজুমদার স্মৃতির অতলান্তে হাতড়াতে থাকে কিছু উদ্ধার করার জন্য।

—মনে পড়ছে না? আমি কিন্তু ভুলিনি। ওই মামলায় নির্মাল্য মল্লিক তোমাদের সাক্ষী হয়েছিল।

ভবেন উল্লাসে লাফিয়ে ওঠে, বলে, তাই তো! আমার মত আহাম্মক আর একটি পাবে না, নন্দী। আমি অঙ্কের মত হাতড়াচ্ছি। তা' হলে ওই নির্মাল্যই তার ঝাঝার বাড়ীতে খুন হয়েছে?

—হ্যাঁ। কিন্তু—

—থামলে কেন?

—লাল-নহলার প্রথম বলি নির্মাল্য।

ভবেন চোখ বড় বড় করে বলে, এরপর আরো আছে? ক'জন লাল-নহলার বলি হ'তে পারে?

—কী করে বলব। লাল-নহলার পরিচয় জানতে পারলে কিছুটা আঁচ করতে পারতাম।

খানিকক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবে। তারপর বলে, 'চতুরঙ্গ' দলের পান্ডাদের খবর রাখো? তারা কে কোথায় আছে, কী করছে—

ভবেন ফাইলের পাতা ওলটাতে ওলটাতে বলে, কয়েক বছর কিছু শোনা যায় নি। মনে হয় দল ভেঙ্গে গেছে।

একলব্য বলে, নির্মাল্য স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করছিল। কোনো দলে ছিল না।

—অর্থ অনর্থের মূল। দলের যারা এদিক ওদিক ছিল, টাকার ভাগ পায় নি, তারা হয়তো এখন অংশ দাবি করছে। ফলে এই খুন। ওই দলের খুবলাল খোসলা হোটেল মধুপ্রিয়ার মালিক। কয়েক লাখ টাকার কারবার করছে। আর একজন রাঘবন, এক কফি হাউসের মালিক। এ ছাড়া আরো আছে, যাদের সম্বন্ধে অনেকদিন কিছু শোনা যায় নি। তাদের মধ্যে কেউ দল গড়ে দলপতি হয়ে বসেছে।

একলব্য বলে, মধুব্রতের কোনো খবর আন্দামান থেকে পেয়েছো?

—না। মনে হয় সে বেঁচে নেই। হাঙ্গরের পেটে গেছে। তার মতন লোক এ রকম কোল্ড ব্লাডেড মারডার করতে পারে না।

।। তেরো ।।

হোটেল মধুপ্রিয়া। বাইরে আলোর ঝলকানি নেই। খরিদ্দার আকর্ষণের জন্য চমক লাগানো কোনো ব্যবস্থা নেই। হোটেলের সামনে মোটরের ভীড় নেই। কিন্তু আশপাশের লেন, বাইলেন গাড়ীতে ঠাসা। লোক আসছে সামনে দিয়ে, সেই অনুপাতে বেরিয়ে যাচ্ছে কম। কোন পথে বেরুচ্ছে, তা বোঝা যায় না। দেশী, বিদেশী জাহাজের নাবিকরা ঢুকছে। দু'-একজন বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাচ্ছে। হৈ হুল্লোড় নেই। সব চুপচাপ। নাবিকের দল কড়া সিগারেট টানতে টানতে ভিতরে ঢুকছে। তাদের অভ্যর্থনার জন্য কলগার্ল এগিয়ে আসে। নাবিকরা যেখানে যেতে চাইবে, সেই পথ, বা সেই হল ঘর তারা দেখিয়ে দেবে। প্রয়োজন হলে সঙ্গে যাবে। মিষ্টি হাসি হেসে নাবিকদের বিহ্বল করতে ছাড়ে না।

রাত সাড়ে এগারো। এক নাবিক হোটেলের সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে ভিতরে ঢোকে। মুখে চাপদাড়ি। নেশায় চুর। পা ঠিক পড়ছে না। কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে, চোখ পিটপিট করে মাঝে মাঝে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখতে দেখতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায়। গোপ চুমরে লম্বা ইজিপশিয়ান্ সিগারেট ধরায়।

কলগার্ল অঙ্গে ঢেউ তুলে হাসিমুখে এগিয়ে এসে বলে, গুড্ ইভনিং, মঁসিয়ে।

মুখে চুমকুড়ি দিয়ে নাবিক বলে, হোঁচট খেলে, সুন্দরী! আমি বাঙালী, সিংহলীজ। বাংলা বুঝি। বলতেও পারি।

কলগার্ল বলে, আপনার চেহারা দেখে মনে হয় না আপনি সিংহলীজ।

—তাই নাকি! আবার চুমকুড়ি।

—কোথায় যাবেন? বার, না ক্যাবারে, না ককটেল হল?

—আপাততঃ নাচের মজলিস। আমি চিনে যেতে পারব সুন্দরী। এক দোস্ত নাথার দিব্যি দিয়ে বলে এসেছে এক পাত্র ককটেল সে আজ

আমাকে খাওয়াবেই খাওয়াবে। আসি সুন্দরী, বাই বাই—শিস্ দিতে দিতে নাবিক এগিয়ে গেল।

বড় হল ঘর। লোকে প্রায় ভর্তি। কয়েক খানা টেবিল খালি। চারিদিকে চঞ্চলতা। হুল্লোড়। মঞ্চে অর্কেষ্ট্রার সুরের তালে তালে লীলায়িত ভঙ্গীতে নাচছে এক তরুণী। তার স্বল্পাবৃত দেহাংশের উপর দিয়ে সরীসৃপ গতিতে হেঁটে চলেছে ফ্লোরের অতি লোভী চোখগুলি। চাপদাড়ি নাবিক এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে দেওয়ালের কাছে ফাঁকা এক টেবিলে বসে। বয় সেলাম করে দাঁড়ায়, জানতে চায়, কী দেবে। নাবিক হাত নেড়ে তাকে যেতে বলে। তার নজর মঞ্চের উপর। কিছু সময় কেটে যায়। আরেকটি সিগারেট ধরায়। মঞ্চ থেকে তার নজর ঘুরে বেড়ায় প্রত্যেকের মুখের উপর দিয়ে।

হাততালি ও হুল্লোড়ে চমক ভাঙে। মঞ্চের নর্তকী দু'জন সহচরীর সঙ্গে নেমে এসেছে ফ্লোরে। প্রত্যেক টেবিলের কাছে গিয়ে সকলকে আপ্যায়িত করে। এ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। সবাই এদের নিয়ে ব্যস্ত।

একজনকে দেখে চাপদাড়ি ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। তাকে অনুসরণ করে' পিছনের সরু আলো-আঁধারি বারান্দায় উভয়ে মুখোমুখি দাঁড়ায়। চাপদাড়ি বলে, কী খবর, সন্ধান মিলেছে? তোমার মেক-আপ্ ভালোই হোয়েছে। কোথাও ধাক্কা খাওনিতো?

—না। এ পর্যন্ত সব ভালোয় ভালোয় উতরেছি। বসুমিতা এসেছিল। হোটেলের ম্যানেজার তিলকচাঁদের সঙ্গে দেখা করেছে। কী কথা হলো, বলতে পারি না।

—বসুমিতা। কোথায় গেল সে?

—তিলকচাঁদের কাছ থেকে ক্যাবারে এসেছিল। যে মেয়েটি নাচছিল, তার সঙ্গে দেখা করে উপরে চলে গেল।

—বুঝেছি মেয়েটি বসুমিতার বোন কবিতা। তারপর?

—আঁধারের মধ্য দিয়ে কেউ আসছে টের পেয়ে ওখানে প্যাকিং বাকসের পিছনে লুকিয়ে থাকি। মনে হলো বসুমিতা দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। তারপরই তিলকচাঁদ বেরিয়ে চলে গেল। প্যাকিং বাকসের পিছন থেকে কান পেতে শুনি বসুমিতা কার সঙ্গে যেন টেলিফোনে কথা বলছে। বসুমিতার কথাবার্তা থেকে বুঝলাম কেউ কবিতাকে রাত বারোটায় যেতে

বলেছে। বার দুই খুবলাল ও রাঘবনের নাম বলতে শুনলাম।

—সাবাস্ সাধন। এই হোচ্ছে লাল-নহলার গুপ্ত ফোন। আমার মনে হয়, খুবলাল এবং রাঘবনের মধ্যে কবিতাকে পাবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে। বসুমিতা লাল-নহলাকে তাই জানাল। ওকে অনুসরণ করলে লাল-নহলার সন্ধান পেতে।

সাধন গলা নামিয়ে বলে, বসুমিতার সন্ধানে যাব?

—লাভ নেই। তাকে ধরা শক্ত। তুমি খুবলালের পিছনে লেগে থাক। দেখ ও কোথায় যায়। স্ স্-স্-স্! কে যেন আসছে।

সাধন তড়িৎ গতিতে সরে যায়। একলব্য প্যাকিং বাক্সের পিছনে বসে।

আগন্তুক এক ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ায়। পকেট থেকে টর্চ বার করে দেখে ঠিক জায়গায় এসেছে কি না। দু'পা সরে দাঁড়িয়ে আস্তে দুবার শিষ দেয়। দূর থেকে শিষের প্রত্যুত্তর আসে। নিশ্চিন্ত হয়ে সিগারেট ধরায়। দিয়াশলাই এর আলো মুখে পড়ে। একলব্য চমকে ওঠে। রাঘবন্! এত রাতে? এখানে? আর এক ব্যক্তি অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে। রাঘবনের পিঠে আলতো ধাক্কা দেয়।

—কে!

—চমকাচ্ছ কেন? কার কথা ভাবছিলে? হাতের চিড়িয়া উড়ল নাকি?

—ও কথা থাক। খবর কি?

—বিবিকে নিজের ঘরে যেতে দেখেছি। সেখানে গোলক পাহারায় আছে। এখন তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করো।

রাঘবন কী যেন ভাবে, তারপর বলে, ঘরে এস। এখানে এসব কথা বলা চলে না।

তালা খুলে ঘরে ঢুকতে যাবে, খস্ খস্ শব্দে চমকে ওঠে। রাঘবন থমকে দাঁড়ায়। মনে ভরসা এনে বলে, ও কিছু না, ছুছুন্দর। অত ভীতু কেন, মদন?

—ভয় কাউকে করি না, একজন বাদে।

—শোন মদন, কবিতাকে ঘুমের ওষুধ খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছি। এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। আমরা লিফট দিয়ে তাকে নিয়ে নীচে নামব। সেখানে গাড়ী থাকবে, সেই গাড়ী করে সোজা—

মদন মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, সবই বুঝেছি, কিন্তু বড্ড ঝুঁকির কাজ, তাই ভাবছি—

—ভাবনা কি ? রূপেয়া তো মিলছে, আরো মিলবে।

মদন খাঁকার দিয়ে বলে, সে তো জানি। একজনের কথা মনে হলে শরীরের রক্ত বরফ হয়ে যায়। যদি টের পায়, তবে তোমার আমার কারো রক্ষে থাকবে না। সব ফরসা !

—অত ভেঙ্গে পড়ো না। ভাবলেই মন খারাপ হবে। চল তোমাকে চাঙ্গা করে দেব। সেই দাওয়াই, কড়া ককটেল্।

॥ চোদ্দ ॥

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে একলব্য খবরের কাগজ তুলে নেয়। চোখ বুলিয়ে থমকে যায়। মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, আবার লাল-নহলা।

সরমা বলে, কী হলো, লাল-নহলা ধরা পড়েছে ?

একলব্য কাগজ দিয়ে বলে, পড়, জোরে। শুনব।

সরমা পড়ে, আবার রহস্যময় লাল-নহলা। হোটেল 'মধুপ্রিয়ার' মালিক রহস্যজনক ভাবে নিহত। আততায়ীর সন্ধানে গোয়েন্দা কুকুর গামা। গত রাত্রে বেলঘরিয়ায় গঙ্গার ধারে নিজ বাগান বাড়ীতে হোটেল 'মধুপ্রিয়া'র স্বত্বাধিকারী শ্রীখুবলাল খোসলা আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন বলে পুলিশের দপ্তরে খবর এসেছে। রাত্রে নাচগান ও খানাপিনার পর খোসলা শয়ন কক্ষে যাবার কিছু সময় পরেই তাকে হত্যা করা হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তদন্ত সুরু করে। গোয়েন্দা কুকুর গামাকে নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু বিশেষ ফল পাওয়া যায় নি। শ্রীখোসলার মাথার বালিশের নীচে একখানা কার্ড পাওয়া যায়, তাতে লাল-কালিতে লেখা আছে : দ্বিতীয় বলি, লাল-নহলা। খবরে প্রকাশ, মাত্র কয়েকদিন আগে বিহারে ঝাঝায় এক শিল্পপতি নিহত হ'লে, তাঁর জামার পকেটে অনুরূপ কার্ড পাওয়া গিয়েছিল। লেখা ছিল : প্রথম বলি, লাল-নহলা। পুলিশ মনে করে এই দুই হত্যাকাণ্ডের আততায়ী একই ব্যক্তি। অল্প কয়েক দিনের ব্যবধানে দু'জন ব্যবসায়ী রহস্যজনক ভাবে নিহত হওয়ায় ব্যবসায়ী মহলে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে।

টেলিফোন বাজে। একলব্য রিসিভার তুলে বলে, হ্যাঁ, বলছি। কে? অধিক্রম পালিত? নমস্কার। বাড়ীতে আছি। আসুন। কথা হবে।

সরমা বলে, কাকে আমন্ত্রণ জানালে?

—অধিক্রম পালিত, সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টর।

একলব্যের কপালে গভীর কুঞ্চন। সাধনের জন্য চিন্তিত হয়। গতকাল সন্ধ্যার পর থেকে ১০নং বাসুদেব রুদ্র লেনের ষ্টীম লন্ড্রির উপর দু'জন ছেলে নিয়ে নজর রাখবার জন্য বলা হয়েছিল। ওখানে শান্তরাম, মদন মাঝে মাঝে আসে। লনড্রির মালিক এক নম্বর ধড়িবাজ। তার কাছ থেকে কোনো কথা বের করা যাবে না। ওদের অনুসরণ করতে পারলে, লাল-নহলা বা বসুমিতার আস্তানার সন্ধান মিলতে পারে। হোটেল 'মধুপ্রিয়া'য় বসুমিতাকে শান্তরামের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেছে। কী কথা হয়েছিল, তা অবশ্য আঁচ করতে পারে নি। শান্তরামকে হোটেল 'মধুপ্রিয়া'য় দেখে একলব্য বিস্মিত হয় নি। এটাই সে আশা করেছিল। একলব্যকে ফাঁসাবার জন্য কী সাংঘাতিক চক্রান্তই না ফেঁদেছিল লাল-নহলা। লোকটীর পরিচয় এখনো জানা গেল না। কে লাল-নহলা? লাল-নহলা হিমালয়ের মত বিরাট রহস্যে আবৃত। পুলিশের রেকর্ড নীরব। তার পরিচয় পুলিশের কাছে অজ্ঞাত। অথচ এই রহস্যময় ব্যক্তিটি কোলকাতা মহানগরীর বুকের উপর দিব্যি চলেফিরে বেড়াচ্ছে। হোটেল 'মধুপ্রিয়া'র মালিক খুবলাল খোসলার হত্যা আর এক রহস্যের সৃষ্টি করল। খুবলাল সেই কুখ্যাত 'চতুরঙ্গ' দলের সঙ্গে জড়িত ছিল। দলের কয়েকজন দাগী বদমায়েস ছাড়া আর সকলে সমাজের উপরের স্তরে জেঁকে আসন পেতেছে। তাদের অতীত বিস্মৃত। বেছে বেছে এদের উপর আক্রোশ কেন?

সদরে ঘন্টি বাজে। একলব্যের চিন্তায় ছেদ পড়ে। জটাধর হাজির হয়ে বলে, দুজন বাবু দেখা করতে চান।

একলব্য বসবার ঘরে প্রবেশ করে, বসুন। কোথা থেকে আসছেন?

—আমরা বড়বাজারে থাকি। আমার নাম দেওকীনন্দন খোসলা। ওর নাম শুভলাল খোসলা। হোটেল মধুপ্রিয়ার মালিক শ্রীখুবলাল খোসলার ভাতিজা।

একলব্য একটু থেমে বলে, বুঝতে পেরেছি। কাগজে পড়েছি। খুবই দুঃখের সংবাদ।

দেওকীনন্দন বলে—আমরা আপনাকে বেলঘরিয়া গিয়ে এই মামলার ভার নেবার জন্য অনুরোধ—

—ওখানে পুলিশ যায় নি ?

—রাত থেকে আছে। ডেড্-বডি এখনো ওখানেই আছে। আপনি গিয়ে দেখার পর পুলিশ বডি নিয়ে যাবে।

—আমার কথা কে বলল ?

—আমি লাল বাজার ডি ডি-র ইন্সপেক্টর শ্রীমজুমদারকে জানি। তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তিনিই আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

—বেশ, যাব। আপনারা দু'জনে বড়বাজার থাকেন ?

—হ্যাঁ। শুভলাল শনি-রবিবার মাঝে মাঝে বেলঘরিয়া যায়।

—ওখানে বাংলোতে আর কে আছে ?

শুভলাল দেওকীনন্দনের দিকে তাকায়, চট্ করে জবাব দেয় না।

দেওকীনন্দন বলে, উনি বন্ধুবান্ধবদের বেলঘরিয়ার বাড়ীতে নিয়ে যান। ওখানে প্রায়ই থাকেন। গঙ্গাজীমে স্নান করেন। হোটেল 'মধুপ্রিয়া'য় ফ্লাট আছে। সেখানেও থাকেন।

—ঠিক আছে। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমি তৈরী হয়ে নিই।

।। পনেরো ।।

লাল-নহলা ডোমিনোতে দেহ আবৃত করে ঘরের এ পাশ থেকে ওপাশ হিংস্র পশুর মত পায়চারি করছে। মাঝে মাঝে বন্ধ জানালার কাছে দাঁড়িয়ে কান পেতে কী যেন শোনে। বংশী দেওয়াল ঘেঁষে চুপ করে দাঁড়িয়ে লাল-নহলার কার্যকলাপের উপর নজর রেখেছে। কথা বলার সাহস তার নেই। এক সময় লাল-নহলা বংশীর সামনে এসে বলে, নেংটির কোনো খবর পেলে ?

—না।

—পুলিশের খপ্পরে পড়ল নাকি ! খুদে টিকটিকি কী করে সরে পড়ল বুঝতে পারছি না। আমার বিশ্বাস, হাত পা কিছুই বাঁধে নি। আহাম্মক ! এই গলার স্বরে বুক কাঁপে। বংশী বোবার মত চেয়ে থাকে।

লাল-নহলা জানালা ঘেঁষে দাড়ায়। বলে, রাঘবনের খবর পেয়েছো? আছে এখানে?

—আছেন। বাগান বাড়ীর ঘটনার পর থেকে রাতে ফ্লাটে থাকেন না। কোথায় রাত কাটান, জানতে পারিনি।

—তুমি যাও। বসুমিতা আসবে। এখানে পাঠিয়ে দিও।

লাল-নহলা জানালার কাছে বসুমিতার আগমন প্রতীক্ষায় দাড়িয়ে থাকে।

—এস বসুমিতা। হঠাৎ কী মনে করে?

বসুমিতা ভনিতা না করে বলে, সকালের দিকে শুভলাল আর একজনকে সঙ্গে করে গোয়েন্দার বাড়ী গিয়েছিল। সে খবর রাখেন?

—জানতাম না।

—নন্দীকে নিয়ে বেলঘরিয়ায় গিয়েছিল।

—এই খবরটুকু জানাবার জন্য এসেছো বলে মনে হয় না।

—নন্দীর বেলঘরিয়ার বাড়ীতে যাওয়া সামান্য ব্যাপার বলে মনে করেন নাকি?

—সামান্য না হলেও চিন্তা করার কিছুই নেই।

—উনি কোথা থেকে কী সূত্র ধরে আপনার সন্ধান পাবেন তা' বলা কঠিন।

বাগান বাড়ীতে কিছুই পাবে না। ওখানে গেছি এবং ফিরেছি 'রাজহংসী'তে। জলের উপর কী সূত্র পাওয়া যায়?

—শান্তরাম কোথায়?

—কোথায় জানিনা। তাকে আমারও দরকার।

—ধরা পড়ে নি তো?

—কী করে বলব। গত রাতে সে ও মদন গোয়েন্দার শাগরেদকে ধরে এখানে আটকে রেখেছিল, আজ সকালে শাগরেদ হাওয়া।

—কী করে পালাল?

—জানিনা। হাত-পা না বেঁধে তাকে গুদাম ঘরে আটকে রেখেছিল। দরজায় তালা ছিল। ওই ঘরে দুটো পেট্রলের খালি ড্রাম ছিল। একটা ড্রাম আর একটা ড্রামের উপর তুলে উপরের চোরা দরজা ঠেলে ছাদে পৌছে কাছাকাছি এক নারকেল গাছের ডাল ধরে নীচে নামতে তার

কোনো অসুবিধা হয় নি। রাতে আমি ও বংশী ছিলাম না। 'রাজহংসী'র গুপ্ত ঘাঁটির সন্ধান জেনে গেল, এটাই ভাবনার বিষয়।

—বেলঘরিয়ার বাংলোতে কিছু ফেলে আসেন নি তো?

—গায়ের জামায় কিনকি দিয়ে রক্ত লেগেছিল। সেই জামা ওখানে গঙ্গার ধারে পুঁতে রেখে এসেছি।

—গোয়েন্দা নন্দীর চোখে শকুনির দৃষ্টি। নাকে অ্যালসেশিয়ানের ঘ্রাণ। পুলিশের কুকুর মাটির নীচ থেকে জামা বের করে আনবে। এতখানি ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হয় নি।

—ধরা এক সময় পড়ব। তার জন্যে ভাবছি না। তবে জামা ওখানে পুঁতে রাখা ঠিক হয় নি।

—আমি বাগান বাড়ীতে যাব?

—কেন?

—ওখানকার হালফিল অবস্থা জেনে আসি। সুবিধে হলে জামা সরিয়ে আনতে পারব।

—তোমার একা যাবার দরকার নেই। এস আমার সঙ্গে, স্পীড বোটে ঘুরে আসি।

॥ ষোল ॥

সাধন নারকেল গাছের নিবিড় পাতার ঘেরাটোপের তলায় ছুৎ করে বসে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ফুস্ ফুস্ ভরে নেয়। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে, পূবদিক ফরসা হচ্ছে ধীরে ধীরে। মাথার পিছন টন্‌টন্ করছে। এক জায়গা সুপারির মত ফুলে আছে। নারকেল পাতার উপর শিশিরের আস্তরণ। হাত বুলিয়ে শিশির নিয়ে ফোলা জায়গা ভিজিয়ে আরাম বোধ করে।

গত সন্ধ্যার ঘটনা মনে করার চেষ্টা করে। সে দুজন ছেলে নিয়ে ১০নং বাসুদেব রুদ্র লেনে ষ্টীম লন্‌ড্রির উপর নজর রেখেছিল। সন্ধ্যার পর বসুমিতা এবং আর একটি মেয়েকে লনড্রিতে দেখতে পেয়ে ছেলে দুজনকে তাদের পিছনে লাগিয়ে দেয়, ওরা কো থায় কোন বাড়ীতে যায়, জানা দরকার। নিজে লনড্রির মালিককে অনুসরণ করার জন্য অপেক্ষায় দাড়িয়ে

থ'কে। এমন সময় শান্তরাম হন্‌হন্‌ করে এসে মালিককে কী যেন বলে' বাস স্ট্যান্‌ডে এসে দাড়ায়। খানিকবাদে মদন এসে তার পাশে দাঁড়ায়। দু'জনে ব্যারাকপুরগামী বাসে ওঠে, সাধনও সেই বাসে তাদের অনুসরণ করে। বাসে উঠে এক কোনে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বেলঘরিয়ায় বি টি. রোডের উপর এক কারখানার কাছে বাস থামে। সামনের দরজা দিয়ে শান্তরাম ও মদন নামে। সাধন পিছন থেকে টুপ্‌ করে নেমে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করে। শান্তরাম এদিক ওদিক তাকিয়ে কারখানার পাশের রাস্তায় হাঁটতে থাকে। সরু রাস্তা। অন্ধকার ঘনীভূত। পাঁচ সাত হাত দূরের জিনিষ দেখা যায় না। চারিদিক নিস্তব্ধ। তার ডাইনে মাঠ, বাঁয়ে ঝোপঝাড়, বাগান। সাধনের শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে হিমস্রোত সিরসির করে বয়ে যায়। এদিকে কখনো আসে নি। কোথায় যে যাচ্ছে, বুঝতে পারছে না। কাউকে দেখতে পায় না। রাস্তার পাশে কালভার্ট। কাছাকাছি যেতেই মাথার পিছনে আঘাত। সাধন জ্ঞান হারিয়ে তুলো'র বস্তার মত গড়িয়ে পড়ে।

কতক্ষণ বেহুঁশ হোয়ে পড়েছিল জানে না। হুঁশ হোলে বুঝতে পারে অন্ধকার ঘরে মেঝের উপর পড়ে আছে। হাতড়ে দেখে, হাতের কাছে কিছু পায় না। হাত পা নাড়তে কোনো অসুবিধে নেই। শুধু মাথা ভারি। পিছনে এক জায়গা ফুলে আছে। কিছু আগে আচ্ছন্ন ঘোরের মধ্যে যেন মোটর বোটের ইন্‌জিনের পট্‌পট্‌ শব্দ শুনতে পেয়েছিল। কোন দিক থেকে শব্দ এসেছিল, চেষ্টা করেও মনে করতে পারে না।

গাছ থেকে নেমে ধীরে ধীরে গঙ্গার দিকে পা বাড়ায়। গঙ্গার ধারে এসে চুপ করে দাড়িয়ে থাকে। দূরে দক্ষিণেশ্বরের কাছে বিবেকানন্দপুল। কী করবে, তাই ভাবে সাধন। মোটর বোটের পট্‌ পট্‌ শব্দ শুনে কান খাড়া করে। ঝোপের আড়াল থেকে কালো রং এর ছোট স্পীড বোট বেরিয়ে বিবেকানন্দপুলের দিকে মোড় নেয়। বোটে তিনজন আরোহী। দু'জন সামনে, পুরুষ। অপর জন পিছনে, মহিলা। মহিলার মুখ লহমার জন্য নজরে পড়েছিল। সাধন চমকে ওঠে। বসুমিতা!

সাধন মনস্থির করে ফেলে। মুরগীর ঘরের দিকে শেয়াল যেমন পা-টিপে এগোয়, সাধন তেমনি গুটি গুটি চলতে থাকে।

———

(চলবে)

রীণা রায়

উমাকান্ত দত্ত

'ইম্পালা' চড়ে চলে গেলে রীণা রায়
শিফনে জড়িয়ে শরীর, চোখে রোদ চশমা
চকিত চপল চাহনিতে মদালসা ভংগী
ফুটপাতে উঠে পড়ি পাছে কাদা ছিট্‌কোয় ।

দশটি বছর আগে তুমি রীণা রায়
পাশের ফ্ল্যাটে ফার্ণ রোডে যবে থাকতে
তেলেভাজা ভালবাসো, সন্টু তা' জোগাতো
কলেজ ফেরৎ তুমি লজেন্স আনতে প্রায় ।

বলতে : 'সন্টু, ভুলবোনা কোনোদিন তোকে
যেখানে যখন যাবো থাকবি আমার কাছে' ;
'তুমি খুব ভালো রীণাদি,' : বলতাম আমি,
আদর করতে তুমি মুগ্ধ সে বালকে ।

আজ তুমি ভুলেছো অতীত, কন্ভেনেণ্টেড গৃহিণী
বেকার তরুণ আমি ঘুরে মরি রাস্তায়

হে কবি !

শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত

তোমার পরশে লোহা, সোনা হ'য়ে ওঠে,
তোমার পরশে কুঁড়ি ফুল হ'য়ে ফোটে ;
তোমার 'সহজ পাঠে' সেই আদি অ-আ
শিখালো কথাটি কওয়া, বাণী মন্ত্র লওয়া ।

অদুরন্ত প্রাণবন্ত জীবনের স্রোতে
সঙ্গীতের সুধাময় সুরধুনী হ'তে
এনেছে আনন্দরাশি ছন্দময় বাণী,
অলকৃতা শ্বেতভূজা বিশ্ব-বীণাপাণি
তোমার লেখনী মুখে আসি কত রূপে
বসুধারে সাজায়েছে পুষ্প, ধূনা, ধূপে ।

কমলার বরপুত্র, মহর্ষি-কুমার,
অসীমের বক্ষে তুমি, আশিস ভূমা-র ।
সুন্দরের প্রতীক তুমি, বিশ্বের বিস্ময়
এনেছো আঁধার ভেঙে ওই জ্যোতির্ময়
রূপে ভরা আলোকের অরূপ-সন্ধান
অনন্ত বসন্ত শোভা, শান্ত মহীয়ান্ ।

বঞ্চিতের সমব্যথী, অক্ষমের সাথী,
শরতের শিউলিসম রেখেছো যে পাতি
আশ্বিনের আসন খানি আশার সঙ্গীতে
প্রাণে প্রাণে ছন্দে গন্ধে ভাষায় ভঙ্গীতে ।
অজানারে এঁকেছো যে শিল্পীর তুলিতে
তাইতো তোমারে কবি, পারিনা ভুলিতে ।

চিত্তের সভায় তুমি—আশ্বাসে, বিশ্বাসে,
অঙ্গে অঙ্গে মিশে আছো আমার নিঃশ্বাসে ।

'প্রভাত সঙ্গীত' 'কথা' 'অচলায়তন'
'কাহিনী' 'চৈতালী' 'চিত্রা' 'অরূপরতন'
'নৈবেদ্য' 'সোনার তরী' 'ক্ষণিকা' 'স্মরণ'
নূপুর-নিক্কণে সাধা বাণীর চরণ ।
তোমার প্রবন্ধ রাশি, রূপকে, নাটকে ,
ত্রিদিব সন্ধান দিলো ধরার পাঠকে ।

পূর্বসুরী কবিদের সাদরে সম্মানে
অপূর্ব সঙ্গীত-সুরে কত ছন্দে গানে
গেয়েছো প্রশস্তি-বাণী শ্রদ্ধায়, সমীহে,
অন্তরের অন্ত হতে বলেছো—"নমি-হে !"
ছোটরে ভাবোনি ছোট—ক'রেছিলে দান
মানুষেরে মানুষের প্রকৃত সম্মান ।

বিরহের দিনে কবি, নিষ্ঠুর আঘাতে
বিচলিত হওনিতো কোনো বেদনাতে ।
মনে মনে বিধাতারে বলেছিলে, "প্রিয় !
এ আঘাত সহিবার শক্তিটুকু দিও ।"
অন্যায়ের দম্ভে শুধু বহ্নি শিখা প্রায়
ক'রেছো স্মরণ তুমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসায় ।

আমার জীবনে কবি, যদি কোনোদিন
অকস্মাৎ চিত্ত হয় বিষাদে বিলীন,
তোমার সঙ্গীত আর সুমধুর ভাষা
আনে শান্তি, আনে সুখ, আনে আলো, আশা ।
তুমি জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, শিল্পী ছবির,
প্রণাম জানাই আমি চরণে কবির ।

ক'টি ছড়া

নিখিল রঞ্জন চক্রবর্ত্তী

ডাল তেলের দাম বেড়েছে
খাইনা ডালের বড়া,
মগজ আমার শুকিয়ে গেলো
লিখবো না আর ছড়া ।

*

মেঘ ডাকলেই জল ওঠে ভাই
কলকাতারই রাস্তাতে,
পথে ঘাটে হই না বাহির
পাই না ছাতা সস্তাতে ।

*

সকাল বিকেল নিভছে আলো
বলছে সবাই লোডশেডিং,
গ্রামে গঞ্জতে যাবে কারেণ্ট
কাগজেতে জোর হেডিং ।

*

টেলিভিসন্ বসবে এবার
দেখতে সবাই তৈরী হোন্,
সচল সবই অচল হবে
অচল সবার টেলিফোন ।

HAVE I DAWNED !

Jyotish Ganguli

I hesitate being cautioned
Subject to the interpretation,
Really am I dawned
To my early perception.

Shivering though I am
In the cruising gale,
Mist, mist and mist
Every where in the dale,
Tet hovering with the phases
One by one in each case,
Hurdle though I am to cross
Happy indeed over the loss.

Passions grow in each stead
Drowned with calmness instead,
Lingering is the name of mind
Living is must with that in mine.

অনুমতি

কুমারেশ ঘোষ

—এই মিনু, আয় না আমাদের বাড়ি!

—না, যাবো না।

—কেন?

—মা বকবে।

—না বকবে না।

—হ্যাঁ, বকবে। মা বলেতে মনুদা দুত্তু।

—ইস—। আমি ভালো। আয়।

—না।

—দেখিস, আমার মা বকবে না। তোকে লেবেনচুস্ দেবো খেতে।

—ক'টা দেবে?

—দুটো, তিনটে, পাঁচটা!

—দাঁড়াও, মাকে বলে আসি!

তিন বছরের মেয়ে মিনু বাড়ির মধ্যে ছুটে গেল পাশের বাড়ীর পাঁচ বছরের ছেলে মনুর সংগে তাদের বাড়ী যাবে কিনা তার মাকে জিগ্যেস করতে।

তখন তারই দিদি দোতালায় পড়বার ঘরে খিল দিয়ে তার প্রেমিককে চিঠি লিখছে—

…তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও, কিন্তু তার আগে তোমার বাবা-মায়ের মত থাকা দরকার। আমার বাপ মায়েরও। বিয়ে তো ছেলে খেলা নয়। সারা জীবনের জন্যে ভার নেওয়া। তা'ছাড়া গুরুজনদের মতামত জানা দরকার, তাঁদের আশীর্বাদও দরকার। তুমি লিখেচো পালিয়ে গিয়ে রেজেষ্ট্রী করে বিয়ে করতে, লিখেচো পরে সব ঠিক হয়ে যাবে, তাঁরা আমাকে ঘরে নেবেন। কিন্তু নাওতো নিতে পারেন! হ্যাঁ তুমি চাকরি করো, আমাকে খাওয়াবে-পরাবে জানি। তবু এ ভাবে আমি বাপ-মায়ের অমতে লুকিয়ে কিছু করতে চাইনে। তুমি বরং তোমার মাকে বলো, আর এসে আমার মাকেও বলো তুমি। যদি তুমি আমাকে ভালবাসো তবে এটুকু এগিয়ে আসবার সাহস তোমার হবে।…… ইত্যাদি।

ভারতের আইন ব্যবস্থা ও মহিলা সমাজ

অরুণা মুখোপাধ্যায় (এ্যাড্‌ভোকেট)

ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনের উন্নতির জন্যই আইনের প্রবর্তন ; বিদেশী শাসনমুক্ত ভারতে আজ এমন সব আইন প্রবর্তিত হয়েছে যা সমাজ জীবনের সমস্ত কাঠামোকে প্রায় পরিবর্তিত করে দিয়েছে। সেই পরিবর্তনের ঢেউ এসে লাগছে এ দেশের মেয়েদের জীবনে। সমস্যাবহুল মেয়েদের জীবনে বিশেষ ভাবে সফলতা এনেছে এই সব আইন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কি সব সেই আইন যা নারীসমাজের ভিত্তিভূমিকে কাঁপিয়ে দিয়েছে? স্বাধীনতার নতুন সূর্য্যালোকে তাই আইনজীবির দৃষ্টি নিয়ে সেই প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছি।

ভারতীয় সংবিধানের ১৪, ১৫, ১৬, ১৯ ও ৩১ ধারা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ আইনের চোখে সকলের সমানাধিকার, নাগরিকের স্বাধীনতার অধিকার ও সম্পত্তি অর্জন, রক্ষা ও ভোগ করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে পুরোপুরি স্বাধীনতা দেওয়া আছে। এ ছাড়া নাগরিক তার অধিকার হতে বিচ্যুত হলে ২২৬ ধারাতে হাইকোর্টে প্রতিবিধানের জন্য আসতে পারেন ও ৩১১ ধারাতে যথেষ্ট উপযুক্ত কারণ না দেখিয়ে নাগরিককে চাকুরী থেকে ছাঁটাই করা যায় না। স্বাধীনতার আলোকে এ হলো এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

অত্যাচারী বা রোগাক্রান্ত স্বামীর সেবায় জীবন কাটানোর অপচয় থেকে স্বাধীন ভারতের নারী সমাজ আজ মুক্ত বর্তমান হিন্দু বিবাহ আইনের মাধ্যমে। এই আইনের ১০ ও ১৩ ধারায় স্বামী বা স্ত্রীকে কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন দুর্ব্যবহার, মানসিক ক্ষতি, যৌনরোগ, বিকৃত মস্তিষ্ক ও ব্যভিচারিত্বের অজুহাতে আইনতঃ পৃথকীকরণ ও বিচ্ছেদের অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই আইনে বহু বিবাহের বিলুপ্তিসাধন ঘটানোর জন্য স্বাধীন ভারতের নারীসমাজ আজ মানসিক গ্লানি মুক্ত।

আর হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের প্রথম ও প্রধান কথাই ত' হলো সম্পত্তিতে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার। মেয়েদের দ্বারা অধিকৃত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এখন মেয়েদের স্বতন্ত্র সম্পত্তি রূপে গণ্য করা হয়েছে ও এই সম্পত্তির ব্যবহার তার ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

স্বাধীন ভারতে আইনতঃ স্বমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য মহিলা-সমাজের পক্ষে হিন্দু দত্তক আইন ও ভরনপোষণ আইনটিরও মূল্য কম নয়। বর্তমান হিন্দু দত্তক আইনে পুত্র, কন্যা উভয়কেই দত্তক নেওয়া যাবে ও বিধবা মহিলা তাঁর নিজের অধিকারে বর্তমানে পুত্র বা কন্যাকে দত্তক নিতে পারেন।

স্বাধীন ভারতে মেয়েদের উচ্চতর সামাজিক পটভূমিকায় হিন্দু ভরণপোষণ আইনে বলা হয়েছে স্বামী স্ত্রীকে যুক্তিসঙ্গত বিনাকারণে ও স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিত্যাগ ইত্যাদি করলে স্ত্রী পৃথক বাসস্থান ও ভরণপোষণের দাবী করতে পারেন। নতুন আইনে পুত্রবধূ, নিঃসন্তান বিমাতা ও অবিবাহিতা কন্যারাও নিজস্ব আয় না থাকলে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ভরণপোষণ পেতে পারেন। এ ছাড়া ১৯৫৪ সালের বিশেষ বিবাহ আইন ও ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইনেও বলা আছে যে স্ত্রীর নিজের ভরণপোষণের মত তেমন সঙ্গতি না থাকলে আদালতে দরখাস্ত করে স্বামীর সম্পত্তি হতে ভরণপোষণ আদায় করতে পারবেন। হিন্দু নাবালকত্ব আইনেও মায়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

তবে শুধু এসব আইনই নয়। স্বাধীন ভারতের নতুন সূর্য্যালোকে বহুদিনের সঞ্চিত অভিশাপ থেকে মেয়েদের জীবন্মুক্ত করেছে আর একটি আইন যা' হলো ১৯৬১ সালের যৌতুক বিরোধী আইন। এই আইনে পণ দাবী বা গ্রহণ করলে অথবা সহায়তা করে থাকলে ৩নং ধারা মতে ছয় মাসের কারাদণ্ড অথবা ৫০০০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ডের একত্রে বিধান আছে।

স্বাধীন দেশের মহিলা আইনজীবির দৃষ্টিতে শুধু এ কথা বলেই শেষ করবো যে সামাজিক ক্ষেত্রে মহিলা সমাজ যেন তাঁদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বলিষ্ঠ মনের পরিচয় দেন নবনির্মিত আইনের সাহায্যে।

গল্প

পুরোটা দিন

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

তিন মহলের মধ্যে নাট মহল সব চেয়ে বড়ো। এখানে বারোমাসে তেরোপার্বণ লেগেই আছে। আর রায় বাড়ীর পার্বণ তো এমনি হতে পারে না! গ্রামের সমস্ত লোক জমায়েৎ হবে সেখানে। পেট পুরে খাবে কালিয়া, কোপ্তা, কাবাব। সারারাত দীর্ঘ উঠোনে বসে দেখবে রং তামাশা, যাত্রা আর পুতুল নাচ।

গত বছর ঝুলনের সময় শহর থেকে রায়বাড়ীর কর্তারা সিনেমা আনিয়েছিলেন। টকি তখনো হয়নি। গ্রামের লোক হতভম্ব। আশ্চর্য! ছোট সাদা একটা পর্দায় ফুটে উঠেছে জীবন্ত মানুষ! এতো বড়ো বিরাট একটা জগৎ! সত্যিই বিস্ময়কর।

এ বছর দুর্গাপূজোয় আয়োজনের কোন ত্রুটি নেই। ছ'দিন রাতে উৎসব চলবে। ঠিক হয়েছে প্রথম দু'দিন হবে থিয়েটার, তৃতীয় দিন হবে কীর্তন, তারপরের দু'দিন হবে যাত্রা আর শেষের দিন হবে পুতুল নাচ।

পূজোর সময় একবার করে নাট মন্দিরে রঙ পড়ে। ছোটকর্তাই সব দেখাশোনা করছেন। বড়োর ডিস্‌পেপ্‌সিয়া। বিশেষ পরিশ্রম করতে পারেন না তিনি। মেজকর্তা তো ছ' বছর ধরে বাতে পঙ্গু। প্রায় সারাদিনই শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দেন। ছোটবাবুর স্বাস্থ্যই একমাত্র ভালো। বেশ সবল এবং সুন্দর। প্রত্যহ ব্যায়াম করেন। কাজেই বিরাট রায়বাড়ীর সমস্ত কিছু তদারক করতে হয় তাকে। বড়ো আর মেজকর্তা সব কিছু তাঁর ওপর ছেড়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত আছেন। ছোট কর্তা মিস্ত্রিদের কাজ পরিদর্শনে বেরিয়েছিলেন। মাধব এসে দাঁড়াল প্রণাম করে। এ বাড়ীর পুরনো চাকর। সারাটা জীবন এই বাড়ীতেই কাটিয়ে দিল। বয়েস তার ষাট। যখন সে প্রথম কাজ রেকত এসেছিল তখন তার বয়স ছিলো ছয়। এই সুদীর্ঘ চুয়ান্ন বছর

সে রায়বাড়ীর ধূলোমাটি আঁকড়ে পড়ে রয়েছে। বাড়ীর চাকর সে কিন্তু চাল-চলন আর হাব-ভাবে তাকে বাড়ীর কোন আত্মীয় বলেই মনে হয়।

হাতের গেলাসটা ছোটকর্তার হাতে দিয়ে মাধব বললো, 'ছোটবাবু, এবার পূজোয় বায়স্কোপ দেবেন না ?'

খাবার পর পেটে ডাবের জল না পড়লে ছোটকর্তার লিভার ভালো কাজ করে না। খাবারগুলো যেন আটকে যায় মাঝপথে। তাই গেলাসটা পাওয়া মাত্রই তাতে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, 'এবার তোদের যাত্রা শোনাবো। ভালো যাত্রা নলহাটির।'

'যাত্রা আর কি শুনবো বাবু। শুনে শুনে তো বুড়ো হয়ে গেলুম। তার চেয়ে—' মাধব থেমে গেলো হঠাৎ। মাথা চুলকোতে লাগল।

'তার চেয়ে কি, বল ?' আর একটা চুমুক দিয়ে ছোটকর্তা বললেন, 'থেমে গেলি কেন ? আনন্দ করবি তোরা, কি চাস বল্‌না ?'

'এই, গ্রামের সকলে বলছিলো যদি গতবারের ঝুলনের মতো বায়স্কোপ দেন দু'দিন !'

'বেশ তো !' গেলাসটা খালি করে মাধবের হাতে দিয়ে ছোটকর্তা আবার বললেন, 'সদানন্দকে ডেকে দে। শহরে লোক পাঠিয়ে দিক এখুনি।'

সদানন্দ রায় বাড়ীর নতুন গোমস্তা। কম বয়েস, কাজে তৎপর ! ছোটকর্তা খুব পছন্দ করেন ওকে। সদানন্দ এসে নমস্কার করে' দাঁড়াতেই ছোটকর্তা বললেন, 'শুনেছ সদানন্দ, গ্রামের লোক তোমার ঐ নলহাটির যাত্রা শুনতে চায় না। তারা তার বদলে চায় বায়স্কোপ।

সদানন্দই ছোটকর্তাকে বলে কয়ে ঠিক করেছিলো এই যাত্রার দল। তারই সহোদর দাদার দল এটি। ছোটকর্তার কাছ থেকে এই কথা শুনে সটান সে মাধবের কাছে গেলো। বলল, 'মাধবদা, ও মাধব দা।'

মাধব তখন ঘুমোবার আয়োজনে ব্যস্ত ছিল। এবং ঘুমের ওপর মাধবের চিরকালের একটা দুর্বলতা আছে। এই সময় ডাকলে সে বেশ বিরক্তই হয়। তাই সদানন্দর ডাক শুনে কিছুক্ষণ জোর করে চোখ বুঁজে থাকে। শেষে না পেরে দরজা খুলে বিরক্ত হয়ে বলে, 'কি ব্যাপার ?'

'শুনলাম তোমরা নাকি যাত্রা-টাত্রা শুনবে না মাধব দা ? আমি বলছিলুম কি, যাত্রা একেবারে বন্ধ করে দিও না, অন্ততঃ একদিন হোক। তোমাদের বায়স্কোপ হোক্ আর দু'দিন। সব দিক তো দেখতে হবে! তোমরা আনন্দ পাবে আর সকলকেও তো তেমনি আনন্দ দিতে হবে!'

'আচ্ছা, সে পরে হবে। এখন ঘুমোতে দাও দিকি একটুকু।'

'না হে মাধব দা। যা হয় এখুনি ঠিক করে ফেলো। আমায় শহরে ছুটতে হবে সন্ধ্যের ট্রেনে।'

মাধবের দু'চোখ ঘুমে ঢুলে আসছিলো। তাড়াতাড়ি সে প্রসঙ্গটা শেষ করতে পারলেই বাঁচে। বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে।'

'দেখো, আবার যেন বাগ্‌ড়া দিও না শেষে!'

'না গো না! তুমি ভেবো না বাবু। মাধব যখন কথা দিচ্ছে তখন আর খেলাপ হবে না কখনো।'

'বেঁচে থাকো মাধব দা।' হাসিমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সদানন্দ। মাধব গভীর আরামে আর তৃপ্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে।

পঞ্চমীর দিন সকালে প্রতিমা দেখতে এলেন রায়বাড়ীর সকলে। যে যেখান থেকে পারে এসেছে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেউ আর বাদ নেই। বাড়ী গিস্‌গিস্ করছে লোকে।

বড়োকর্তার সব চেয়ে প্রিয় শিশুটির বয়স পাঁচ বছর। ডাক নাম শান্ত। ছোটকর্তার বড়ো মেয়ের ছোট ছেলে। চমৎকার ফুটফুটে ছেলেটি। চালাক-চতুরও বটে। ঘুড়ি ওড়াতে আর ফুটবল খেলতে খুব ভালবাসে।

মাধুরী বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই বড়োকর্তার হুকুম তার কানে পৌছলো। প্রথমেই সে উঠে গেলো বড়োকর্তার ঘরে শান্তকে নিয়ে। বড়োকর্তাকে দেখে শান্তর আর আনন্দ ধরে না। ছুটে মার কোল থেকে সে বড়োকর্তার কোলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। বড়োকর্তা তাকে কোলে তুলে নিলেন, এঁকে দিলেন তার কপালে আর সীমন্তে অনেক চুমা।

'দাদু, আমার ঘুড়ি আর ফুটবল!'

'এই যে দাদু!' আলমারী খুলে বড়োকর্তা বার করলেন এক ডজন বড় বড় ঘুড়ি আর একটি লাটাই। আনন্দে লাফ দিয়ে উঠলো শান্ত।

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে করতে মাধুরী মৃদু হেসে বললো, 'তাই মামার বাড়ী আসার জন্যে কি কান্না !'

বড়োকর্তা শান্তকে আদর করতে করতে হেসে উঠলেন ।

মহাষ্টমী । সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে । এখুনি ঢাক ঢোল কাঁসি বেজে উঠবে । মায়ের আরতি হবে । শান্ত বড়োকর্তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাড়ীময় ।

'দাদু ওটা দিয়ে কি হবে ?'

'ওটা কি বলো দিকি আগে ?'

'ছাগল !'

'বাঃ ।'

'ওটা দিয়ে কি হবে দাদু ?'

'মায়ের কাছে ওকে বলি দেওয়া হবে ।'

'বলি কি দাদু ?'

'ওকে মায়ের প্রসাদ করে আমরা খাবো ।'

'ও' । চুপ করে গেলো শান্ত ।

বার বার বলা সত্বেও শান্ত বলির সময় কিছুতেই সে-জায়গা ছেড়ে গেলো না । সকলে ওকে যতো টানাটানি করতে লাগলো ও ততো জোরে বড়কর্তাকে আঁকড়ে ধরে রইল । শেষে বড়োকর্তাই বললেন, 'থাক ও আমার কাছে । কোন ভয় নেই ।'

মায়ের আরতি শুরু হলো । আধ ঘণ্টা পর আরতি শেষ হল । এবার বলি হবে । হঠাৎ ঢাক, ঢোল, বাঁশী, কাঁসর একসঙ্গে চতুর্দিক মুখরিত করে বেজে উঠল । বলি হয়ে গেলো । ভয়ে বিস্ময়ে দাদুর কোলে সেই যে মুখ লুকোল শান্ত আর তুললো না কিছুতেই । ডাকা-ডাকিতেও সাড়া দিল না সে । অজ্ঞান ।

বিদ্যুতের মতো খবর হয়ে গেলো সমস্ত বাড়ীময় । মেয়ে মহলে কান্নার রোল পড়ে গেল । মাধুরী উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলো সেখানে । রায়বাড়ীর মেয়ে এই প্রথম উৎসবের দিনে একরাশ লোকের সামনে বাইরের মহলে এলো ।

ধরাধরি করে ততক্ষণে শান্তকে তোলা হয়েছে ।

ছোটকর্তা ডাক্তার আনতে ছুটেছিলেন নিজেই। ডাক্তার শশব্যস্তে এসে হাজির। পরীক্ষা করে বললেন, 'না, কোন ভয়ের কারণ নেই! সিম্‌প্লি এ কেস অব নারভাস্ ব্রেক ডাউন।'

সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। মেয়েরা চলে গেলো কাজে। শাস্তর কাছে রইলেন বড়োকর্তা। উৎসব আর জমল না পরে পরে। জমিদার বাড়ীতে অসুখ থাকলে কি কখনো প্রজারা প্রাণ খুলে আমোদ করতে পারে?

শাস্তর অসুখ শেষে অন্য রূপ নিল। মাঝে মাঝে ফিট শুরু হলো। বুকে বসলো সর্দি। শেষে অসুখটা বেশ জাঁকিয়ে বসল। শহরের বড়ো বড়ো ডাক্তারের মিটিং বসে গেল বাড়ীতে। জলের মত পয়সা খরচ হতে লাগল। মাধব রাত জেগে জেগে শাস্তর সেবা করতে লাগলো। মাধুরীকে বকাবকি করে ঘুমোতে পাঠায় সে। নিজে জেগে বসে থাকে শাস্তর শিয়রে।

পুরো দেড় মাস ভুগে শাস্ত ভালো হয়ে উঠলো। অমন সুন্দর স্বাস্থ্য চুপ্‌সে গেছে। আগেকার দীর্ঘ চোখ দুটো এখন কালিপড়া। কোটরে ঢুকে গেছে। গায়ে রক্তের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সমস্ত শরীর ফ্যাকাসে, বিবর্ণ, পাণ্ডুর।

দিন পনেরো পর শাস্ত যখন চলতে ফিরতে পারছে, বড়োকর্তা তখন ওকে নিয়ে চেঞ্জ-এ গেলেন। মাধুরীও সঙ্গে গেলো।

তারপর এক এক করে কেটে গেছে অনেক বছর। রায়বাড়ীর পরিবর্তন হয়েছে অনেক। একটা ঝড় যেন বয়ে গেছে এর ওপর দিয়ে। তার আঘাতে শতচ্ছিন্ন শত-দীর্ণ হয়ে সমস্ত বাড়ীটা নুয়ে পড়া একটা বৃদ্ধের মতো যেন ধুঁকছে! গ্রামে আসছিল সোমনাথ, ছোটবেলার সেই শান্ত। সঙ্গে তার স্ত্রী কাকলি। ছেলে মানস আর মেয়ে লতা। তাদের নৌকো থেকে ঘন দেওদার আর ঝাউগাছগুলোর মধ্যে দিয়ে রায়বাড়ীটাকে মনে হচ্ছিল যেন কোন পরিত্যক্ত ভূতুড়ে-বাড়ী। ইট খসে খসে পড়ছে। খানিকটা ভেঙে গেছে ওদিকের পাঁচিল। হাড় পাঁজরা সম্বল যেন এক মরণাপন্ন রোগী মাটির বিছানায় যন্ত্রণায় শুয়ে কাতরাচ্ছে। সে বুঝতে পারে, এ রোগ মরণের। এ রোগের হাত থেকে ওর কোন

প্রকারেই নিষ্কৃতি নেই। গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে সোমনাথ অন্যদিকে মুখ ঘোরালো।

কাকলি কাছে সরে এসে একটি হাত গায়ে দিয়ে আর একটা হাত সামনে বাড়িয়ে বললো, 'ঐ রায় বাড়ী দেখা যাচ্ছে, না?'

ঘার নেড়ে জানাল সোমনাথ, 'হ্যাঁ'।

কাকলির মনে আজ নিদারুণ অভিমান। বিয়ের পর সে কতোবার বলেছে তাকে একবার নিয়ে যেতে রায় বাড়ীতে। একবার তার সঙ্গে রায়বাড়ীর সকলের পরিচয় করিয়ে দিতে। কিন্তু সোমনাথ শুধু আশ্বাস দিয়েছে, নিয়ে যাবে। যায়নি। জেদ করেও কোন লাভ হ'ত না। বরঞ্চ সোমনাথ গম্ভীর হয়ে উঠত। সে কারণে সে আর জোর করত না। মাঝে মাঝে পূজোর আগে মনে করিয়ে দিলে সোমনাথ মৃদু হেসে বলে উঠতো, 'ভোলোনি দেখছি।' সে তাই মনের আক্ষেপ মনেই পুষে রাখতো। এতদিন পর, পনেরো বছর পর সোমনাথ তাকে অবশেষে নিয়ে এসেছে।

সোমনাথের মন আজ ছুটে গেছে চল্লিশ বছর আগেকার একটি উৎসবকে কেন্দ্র করে অনেক দূরে। এই রায়বাড়ী ছিল হাস্যে লাস্যে ভরপুর। সে ছিল তখন শিশু। একটু আঘাতেই সে মুষ্‌রে পড়তো। একটু বেদনাতেই সে কেঁপে উঠতো, কেঁদে ফেলতো। আশ্চর্য! নিজের কাছে আজ এই প্রথম নিজেকে কেমন যেন অচেনা অজানা লাগলো তার। সে তো এমন ছিলো না! নিজের অজ্ঞাতসারে এতো বদলে গেছে সে? এতো রূপান্তরিত হয়ে গেছে সে?

শেষ জীবনে ছোটকর্তা তো মারা গেলেন একরকম বিনা চিকিৎসায়। এ সব কথা আর গ্রামের কে না জানে? একে একে কর্তারা আর বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা দেহ রাখলেন। অতো বড়ো রায়বাড়ী শেষে হয়ে দাঁড়ালো জন-মানবহীন দৈত্যদানবের আখড়া।

তবু জমিদার বাড়ীর সম্পর্কের একজন এসে এ বছর পূজোটা যদি করে সে-জন্যে গ্রামের লোক তার কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকবে। হোক নিতান্ত নিরাভরণ, নিতান্ত সাধারণ পূজো। তবু পূজো তো। মায়ের নাম যে হবে বৎসরান্তে একবারও রায়বাড়ীর দরদালানে, সেই যথেষ্ট! গ্রামবাসীর এই অনুরোধ ফেলতে পারেনি সোমনাথ।

অষ্টমীর দিন সন্ধ্যের সময় যদু নিয়ে এলো দু'টো পাঁঠা।

সোমনাথের ছেলে মানস বাইরেই ছিলো। পাঁঠা দুটোকে দেখে বললো, 'বাঃ! চমৎকার পাঁঠা তো! মন্দ হবে না আজ রাতে!'

মহাষ্টমীর দিন বলির সময় সোমনাথের উপর সমস্ত বাইরের ব্যবস্থার ভার পড়েছে। সে প্রথমেই ঝিয়ের কোলে ছোট্ট একটি ছেলেকে দেখে বললো, 'ওদের কেন এনেছো এখানে? এ কখনো ওদের সহ্য হয়? বড় হোক্ তখন দেখবে।'

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

অনূদিত ও রচিত গ্রন্থাবলী

কেরল সিংহম, চিংড়ি, ইন্দুমতী, রমণী, দাক্ষণাবর্তের রাণী, আম্রপালী, জেলেনী, অশ্রুত এক রাগিণী, দেবদাসী, অগ্নিকন্যা, নায়িকার নাম গীতা, তুমি আমায় কম্যুনিষ্ট করেছ, একটি প্রেমের কাহিনী, মঙ্গলা, নায়িকা, সন্ধ্যারাগ, কান্তম, জানা-অজানা, বাড়ি-পালিয়ে, সুরের সানাই বাজুক, প্রতিবেশিনী, ভারতীয় গল্প সংকলন, আধুনিক ভারতের গল্প সঞ্চয়ন, একসূত্রে গাঁথা, কেরালার গল্পগুচ্ছ, অন্ধ্রের গল্পগুচ্ছ, আমার দেশের লোককথা, ভারতের রূপকথা, সূচনা, নাটিকা, আজকের ডাক, আধুনিক ভারতের কবিতা সঞ্চয়ন এবং শুধু প্রেম...। সবে বেরোলো : নারায়ণ রাও ১০·০০।

ডায়েরী

ফাদার লাফোঁ

আজ সকালে সুস্‌মিতা এসেছিলো এক প্যাকেট মিষ্টান্ন নিয়ে। ওর কোলে নবজাত শিশু পুত্রটি মিট্‌ মিট্‌ করে আমাকে দেখছিলো। ওদের জন্য ঈশ্বরের নিকট আশীরবাদ্‌ প্রার্থনা করলাম।

আমার পুরাতন ডায়েরীর বিভিন্ন অংশে ওদের কথা মাঝে মাঝে লেখা আছে। আজ সুন্দর প্রভাতে সুস্‌মিতা বিদায় নেওয়ার পর ওদের গত দু' বছরের কথাগুলো মনে পড়ছিলো।.....আমি সেদিন দুপুরে সাইকেলে অনেকটা ঘুরে ক্লান্ত হয়ে একটি উদ্যানে আশ্রয় নিয়েছিলাম। উঁচু বিশ্রাম ঘরের একটি কোনে বসে সহসা দু'টি তরুণ-তরুণীর সংলাপ শুনতে পেলাম। ওরা নীচে ঘাসের উপর বসেছিলো, তাই আমাকে দেখতে পায়নি।

তরুণী : আমার আর কিছু বলার নেই। মা-বাবা পাত্র দেখেছেন। আগামী মাসেই দিন পাকা হবে। এর মধ্যে তুমি কিছু করতে না পারলে...(কণ্ঠস্বর কান্নায় রুদ্ধ হয়ে এলো)।

তরুণ : সুস্‌মিতা, আমি কি করবো বলো! তিন বছর ধরে কত জায়গায় ঘোরা-ফেরা করলাম একটা চাকুরীর জন্য। আমি তো চেষ্টার ত্রুটি করছিনা!

সুস্‌মিতা : দেবাশীষ, আমি তা' জানি। কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমি কিছুতেই.....

দেবাশীষ : শান্ত হও সুস্‌মিতা। দেখো, ভগবানের কৃপায় এর মধ্যে একটা কিছু হবেই।

আমার ভালো লাগল ওদের দু'জনকে। বললাম : দেবাশীষ, আমি তোমাকে একটা চাকুরী ব্যবস্থা করে দেবো। তোমরা ভয় পেওনা।

আমার কণ্ঠস্বরে ওরা দু'জন প্রথমে চমকিত হ'লো। দেবাশীষ্‌ সন্দেহ ভরা চোখে তাকিয়েছিলো। সুস্‌মিতা চোখ মুছে বিস্ময় ভরা মন নিয়ে বলল : সত্যি বলছেন? আপনি কেমন করে দেবেন ফাদার?

আমি হাসলাম। তারপর আমার পরিচিত একটি বন্ধুর নিকট তদ্‌বির করে' দেবাশীষকে একটি ফার্মে সেলস্ প্রমোশানে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। দেবাশীষ আমার সংগে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলো। চোখে সন্দেহ নেই, বুক ভরা বিশ্বাস। বলেছিলো: সুস্‌মিতার বাবা ছ'মাস পরে চাকুরী কনফার্মড হলে বিবাহ দেবেন। ঠিক আছে, আমিও ততদিনে গুছিয়ে নিই—কি বলুন ফাদার ?

আমি হেসে সম্মতি জানিয়েছিলাম।

তারপর ওদের বিবাহ হ'ল। আমাকে দু'জনে মিলে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলো।

ফুলের মতন শিশু পুত্রটি ওদের কোলে এলো তিন মাস আগে। দেবাশীষ আমাকে সুসমাচার দিয়েছিলো। আর আজ সুস্‌মিতা নিজে এসেছিলো সন্তানটিকে নিয়ে আমাকে দেখাতে। হাসতে হাসতে বলেছিলো: ফাদার, দেখুন, হাসলে ঠিক দেবাশীষের মতন দেখায়। আপনি আশীর্বাদ্ করুন ফাদার।

ঈশ্বরের নিকট আবার প্রার্থনা জানালাম: ওদের জীবন কল্যাণময় হোক্।

With Compliments of :

MODIRAM RAMLAL

P. O. SHANKARGARH (C. Rly.)
Dist. ALLAHABAD. U. P.

Mine Owners & Manufacturers
of Quality Silica Sand

ধর্মক্ষেত্র

সৌমিত্র বসু

ভীড়। ভীড় জমেছে কোর্টের বাইরে। তবে ঠিক যাকে বলে উত্তুঙ্গ অবস্থা, তাও নয়। বরং বলা যায় একটা প্রচণ্ড ঝড়ের থমথমে পূর্বাভাষ। যেন একটু পরেই এখানে একটা মারাত্মক কিছু ঘটবে।

একটু বিরক্ত মতন হল বিভাস। কপালের চামড়ায় ভুরুর কাছে ওপর থেকে নীচে কয়েকটা ঢেউ উঠল। এই এক হয়েছে। দিন, নেই, রাত নেই, হাঙ্গামা হুজ্জুত লেগেই আছে। মালিকগুলোরই বা দোষ কি! এই দাও, সেই দাও, হ্যান ত্যান—অবশ্য এ সব ভাবনার কথা কাউকে বলে না বিভাস। গালাগাল তো অবধারিত, সে রকম ক্ষেত্রে মারধোর পর্যন্ত খেয়ে যেতে পারে। দিনরাত ময়দানের মিটিঙে, খবরের কাগজে আর রেডিওতে এক বুলি, প্রতিক্রিয়াশীল, ধনতান্ত্রিক, একনায়ক, বুর্জোয়া—মানে বুঝুক আর নাই বুঝুক, মুখে ঐ এক কথা দেশশুদ্ধ লোকের।

এই সমস্ত ভীড় ভাট্টা এবং বিভিন্ন দাবী আদায়ের জন্য শ্লোগান অত্যন্ত রাগী করে তোলে বিভাসকে। সেও যে খুব একটা কোটিপতি কোন বাপের ছেলে, তাও নয়। তাকেও দশটা পাঁচটার অফিস করতে হয়, ঘরে তারও পঙ্গু বাবা আর বিক্ষুব্ধ শীর্ণা স্ত্রী আছে, তার ছেলে মেয়েরাও পূজোর সময় পাশের বাড়ির বন্ধুদের মত জামা কাপড় পেতে চায়, মধ্যবিত্ত ক্লাসের দুঃখ সেও বোঝে। সেও জানে অবস্থা এখন চরমে, এবং এর বিরুদ্ধে একটা সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ করা দরকার। কিন্তু সে সব ছেড়ে এ কি হচ্ছে!

হঠাৎ একজন ভদ্রলোক বেড়িয়ে এলেন ফ্যাক্টরির ভেতর থেকে, সঙ্গে সঙ্গে এক দঙ্গল লোক প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘিরে ফেলল তাঁকে।

শঙ্কিত হল বিভাস, ভদ্রলোক কোট প্যান্ট পড়েছেন, এবং গেটের ভেতর থেকে বের হলেন। অতএব নিশ্চই মালিক পক্ষের গণ্যমান্য

কেউ। আর যেভাবে চিৎকার করে ওদিকে ছুটে গেল জনতা, তাতে করে তাঁর আহত হবার সম্ভাবনা ষোল আনা।

কিন্তু সে ধরণের কিছু তো দেখা গেল না! ভদ্রলোক দু'হাত তুলে কি যেন বোঝাচ্ছেন সকলকে; এবং এত দূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সম্ভবতঃ উত্তেজনায় পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে মাঝে মাঝেই লম্বা হয়ে উঠছেন তিনি।

বিভাস এবার চলে যাবার কথা ভাবছিল। হাজার হোক, এবং কোন একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে বা করবার চেষ্টা করছে, এ সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখার ব্যাপারটা নিজের কাছেই কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকে।

চলেই যাচ্ছিল, এমন সময় জনতা আবার গর্জন করে উঠল। দেখা গেল ভদ্রলোক আগের চেয়েও বেশি উত্তেজিত ভাবে বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে লাফাচ্ছেন, হাত দুখানা কোটের পকেটে ঢোকানো, এবং তাঁর চারপাশে মারমুখী জনতা।

ভদ্রলোক আরো দুবার উত্তেজিত ভাবে লাফালেন এবং তারপর ডানহাতের তর্জনি তুলে শকুন্তলাকে দুর্বাশার শাপ দেওয়ার মত একটা ভঙ্গি করে ইঁদুরের মত গেটের দরজা দিয়ে গলে গেলেন।

ভীড়টা এবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। পাঁচ ছ'জনের এক একটা দলে ছড়িয়ে গিয়ে সকলেই খুব উত্তেজিত ভাবে চিৎকার করতে লাগল।

বিভাস বুঝতে পারছিল এবার একটা কিছু গণ্ডগোল হবে। হয় এরা কারখানার গেট ভাঙবার চেষ্টা করবে, নয়তো ওরা পুলিশ ডাকবে, কিংবা—

বলতে বলতে জায়গাটা কি রকম যেন চনমন করে উঠল। অদূরেই একটা পরিচিত হর্ণ শোনা গেল। লোকজন পালাচ্ছে। হঠাৎ বিভাস যেখানে দাঁড়িয়েছিল সে জায়গাটা অন্ধকার হয়ে গেল। ঘার ফিরিয়ে দেখল বিভাস, তার পেছনে মণিহারি দোকানটা ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা লণ্ঠনও বন্ধ হয়ে গেল। রাস্তা প্রায় ফাঁকা। দক্ষিণ কলকাতার নিরুপদ্রব অধিবাসীরা ভীত অবাক চোখে পুলিশের আগমনের প্রতীক্ষা করছিল। বিভাস তাড়াতাড়ি একটা তিনতলা বাড়ির খোলা সিঁড়ির দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ঝড়ের মত পুলিশ ভ্যান এল। টপাটপ গাড়ি থেকে আট-দশ জন কনষ্টেবল নামল। লাঠিচার্জ শুরু হয়ে গেল। একজন লুঙ্গি পরা গেঞ্জি গায়ে ভদ্রলোক মজা দেখবার জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন, একটা পুলিশ তার রগের ওপর আড়াআড়ি চালালো। কোন শব্দ না করেই ভদ্রলোক পড়ে গেলেন।

তারপর একজন রোগা মতন আধবুড়ো। বিভাস লক্ষ্য করেছিল, এই লোকটি শ্লোগান দিচ্ছিল। পায়ে বোধ হয় কোন ডিফেক্ট আছে, তাই তাড়াতাড়ি পালাতে পারে নি।

আরো কিছুক্ষণ শিবের তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়ে, বন্ধ সেলুনের কাঁচের দরজা ভেঙ্গে, একটা বাড়ির জানালা ফাটিয়ে দিয়ে পুলিশ ভ্যান চলে গেল শেষকালে।

তারপর সমস্ত শান্ত। এত শান্ত যে সহজেই আকাশের অস্থির তারাদের দিকে দৃষ্টি চলে যায়। বিভাস বেরিয়ে এল। রাস্তাটা একটা বিশাল ফাঁকা মাঠের মত লাগছিল, আর তার মধ্যে সারা দেহে যন্ত্রণার চিহ্ন নিয়ে দু'জন মানুষ উপুড় হয়ে পড়েছিল।

বিভাস মনে মনে প্রশ্ন করল, 'কি হে সৈনিক, তোমরা পাণ্ডব পক্ষ, না কি কৌরব ?'

একটি ঘোষণা

আমাদের গত 'ভ্রমণ সংকলন' খানি বিশেষ জনপ্রিয় হওয়ায় অনেকে উক্ত সংখ্যা পাঠাবার জন্য অনুরোধ করেছেন। সকলের অবগতির জন্য জানাই—ভ্রমণ সংখ্যাটি সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয়েছে। অতএব ঐ সংখ্যার জন্য চিঠি বা টাকা পাঠাতে নিষেধ করা হচ্ছে।

—কর্মসচিব, নবকলি।

নীতা

সমীর কুমার দত্ত
সভ্য সংখ্যা—৫২৮

চৌদ্দ বছর পর আবার নীতার সংগে দেখা হোল। এতদিন পর ওইভাবে যে আমাদের দেখা হবে ভাবতেও পারিনি। নীতা মেদ বহুল দেহটা নিয়ে সেই থেকে আমার দিকে এক দৃষ্টে চেয়েছিল। আমি চোখের চশমাটা খুলে অনাবশ্যক মুছ্‌তে লাগলাম।

…সংসারের আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য ছাত্রাবস্থাতেই আমাকে অর্থের সন্ধানে বেরোতে হয়েছিল। অন্য কিছু না পেয়ে প্রাইভেট টিউটরের কাজ নিলাম। এক বন্ধুর অনুরোধে ক্লাস নাইনের ছাত্রী নীতাকে পড়াবার দায়িত্ব নিয়েছিলাম।

তারপর কখন কি ভাবে জানি না নীতার সংগে আমার মন দেওয়া-নেওয়া শুরু হোল। কোনদিন না গেলে পরদিন মুখ ভার করে বসে থাকত। পড়ানো তো দূরের কথা, কথাও বলা যেত না।

প্রায়ই নীতাকে নিয়ে বেড়াতে যেতাম। কোনো কোনো দিন বাড়ি ফিরতে দেরী হোলে নীতাকে মিথ্যা কথা বলতে হোত।

একদিন নীতাকে নিয়ে কোলকাতা থেকে সিনেমা দেখে ফিরছি, হঠাৎ বাসের মধ্যে নীতার বাবার সংগে দেখা। আমি আর নীতা দু'জনে একই সীটে বসে। ওর বাবার সংগে চোখাচুখি হোতেই আমার সমস্ত দেহের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ বইতে লাগল। হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে গেল। কি করব, না-করব কিছুই ঠিক করতে পারছিলাম না। নীতা জানালা দিয়ে বাইরে চেয়েছিল। ঠিক এই সময় বাসটা থামতেই একটি মেয়ে উঠল, আমি লেডিস্ সীট ছেড়ে নীতার বাবার ঠিক উল্টো দিকে এক পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তার পরদিনই এক মাসের মাইনে সহ ডিস্‌চার্জ নোটীশ পেলাম। সেদিন থেকেই প্রাইভেট পড়ান ছেড়ে দিয়েছিলাম।…

দীর্ঘদিন পরে এক বৌভাতের অনুষ্ঠানে আজ আমরা উভয়েই সপরিবারে নিমন্ত্রিত। নীতা সেই থেকে চেয়ে আছে তো চেয়েই আছে। কি দেখছে! পাশেই ছিল নীতার বর। একবার আমার দিকে একবার নীতার দিকে চাইছে। নীতাকে চেনাই যাচ্ছিল না। কেমন যেন পাল্টে গেছে ও।

হঠাৎ আমার চার বছরের ছেলে তার মাকে দেখতে না পেয়ে দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, বাবা, মা কোথায়? ওকে চট্ করে কোলে নিয়ে নীতা আদর করতে লাগল। যাক তবু চিনতে পেরেছে। আমি কি বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। এমন সময় নীতা আমাকে দেখিয়ে ওর স্বামীকে বলল, আমার মাষ্টার মশায়।

নীতার বরের সংগে নমস্কার বিনিময় করার পর ভদ্রলোকের ডাক পড়াতে উনি চলে গেলেন।

নীতা ওর ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একখানা কার্ড দিয়ে বলল, ঠিকানা দিলাম, মাঝে মাঝে দেখা করো। পরিচয়টা যেন মাষ্টার মশায়তেই থাকে বুঝলে!—নীতা ওর বরের পিছু নিল।

আমার নিজেকে বড় ছোট মনে হোল। কথা বলতে পারলাম না। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

With Compliments of :

NANAK SINGH SARDARILAL

Merchants, Contractor & Silica Sand Manufacturers

P. O. SHANKARGARH
Dist. ALLAHABAD. U. P.

শতাব্দীর অভিশাপ

শ্রীঅজিত কুমার ব্যানার্জ্জী

সভ্য সংখ্যা—৫২৪

মানুষের যাত্রা চলেছে মহাদেশ মহাকাল
অতিক্রম করে, দুর্গম হতাশার মায়া
ভেদ করে, অবিশ্বাসের অন্ধ বিবর
হ'তে বিশ্বাসের পুণ্য সলিলে পৌছবার
নবীন উদ্যমে। সুখনিদ্রার জড়তা কাটিয়ে
জীবনের প্রথম উন্মেষ ; তখন অনেক রাত্রির
শেষে অনেক আঁধার পেরিয়ে পৃথিবীর
সীমাহীন জ্যোতি দেখে সে ভালবাসে পৃথিবীকে।

এই অভিশপ্ত শতাব্দীর শেষে, আজ
যখন জ্ঞানের চেয়ে অজ্ঞানের প্রশ্রয়
ঢের বেড়ে গিয়েছে, যখন অশান্ত
মানুষ তার অস্তিত্বকে হারিয়ে
ফেলেছে, তবুও আকাশে নক্ষত্র
নীলিমার সফলতা আছে।
শক্তি আজও আছে, কিন্তু নেই শান্তি !

কবি রবির কৌতুককণা

শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)

সবুজ সরবৎ

একবার গ্রীষ্মকালে কলকাতার একজন তরুণ অধ্যাপক গলদ ঘর্ম হয়ে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। তখন শান্তিনিকেতনে বৈদ্যুতিক আলো-পাখার প্রচলন হয়নি।

ট্রেন থেকে নেমে অধ্যাপক মশাই সরাসরি কবির সঙ্গে দেখা করতে যান। তখন কবির সঙ্গে দেখা করার কড়াকড়ি ছিল না। তিনি ঘর্মাক্ত হয়েই উপস্থিত হয়েছিলেন। গিয়ে দেখেন, কবি চুপচাপ বসে একটি সবুজ রঙের সরবৎ পান করছেন।

তরুণ অধ্যাপক ভাবলেন তার ভাগ্যেও এক গেলাস সরবৎ নিশ্চয়ই জুটবে। কথা-বার্ত্তায় সময় কেটে যায়। কিন্তু প্রার্থীত সরবৎ আর আসে না।

তরুণ অধ্যাপক ঘন-ঘন সরবতের গেলাসের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাতে লাগলেন।

কবি রসিক মানুষ। অধ্যাপকের মনের কামনা বুঝতে পারলেন। শুধু একবার জিজ্ঞেস করলেন, চলবে? লাজুক লাজুক মুখে তরুণ অধ্যাপক মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। কবি ডাকলেন তার প্রিয় ভৃত্য বনমালীকে। বললেন, বাবুকে এক গেলাস এই সরবৎ দাও।

তরুণ অধ্যাপক এক চুমুক দিয়ে আর মুখ বন্ধ করতে পারেন না।

কবি স্মিত হাস্যে বললেন, নিমপাতা বাটা সরবৎ। আমি রোজ খাই।

দণ্ডদান

শান্তিনিকেতনের এক অধ্যাপকের কাছে একদিন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা একটি চিরকুট গিয়ে হাজির হ'ল। তাতে লেখা, আগামী

কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আপনার কাজের জন্ত আমি দণ্ডদান করবো।

ছোট্ট কাগজের টুকরোটি পেয়ে অধ্যাপকের চোখে আর ঘুম নেই। কি অপরাধ তিনি করলেন যার জন্ত স্বয়ং কবি তাকে দণ্ড দান করবেন! সারারাত অধ্যাপকের ভালো ঘুম হ'ল না। সকাল বেলা তিনি হন্ত দন্ত হয়ে কবির কাছে গিয়ে হাজির হলেন।

কবি খুব প্রত্যুষে উঠে কবিতা রচনা করছেন। অধ্যাপকের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা-বার্ত্তা হল। সকাল বেলার জলযোগও সমাধা হল সেখানে। কিন্তু কবি ত দণ্ডদানের কথা কিছু বলছেন না। তিনি কি কালকের পাঠানো চিরকুটের কথা একেবারে ভুলে গেছেন?

অবশেষে ভয়ে ভয়ে অধ্যাপকই তাঁকে সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, আপনি আমাকে কি দণ্ডদান করবেন লিখেছিলেন?

কবি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। ওই যে ঘরের কোণে রয়েছে তোমার দণ্ড। ওটাই দান করবো।

অধ্যাপক বুঝলেন, গতকাল তিনি কবির ঘরে লাঠিখানা ফেলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তখন তিনি হাসবেন, না কাঁদবেন?

জোড়াসাঁকো

বহুকাল আগের কথা। সাহিত্যিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় তখন প্রবাসী কাগজের সহঃ সম্পাদক।

রামানন্দবাবুর নির্দ্দেশে চারুবাবুকে প্রায়ই কবির সঙ্গে দেখা করতে হয়। লেখার তাগিদ দিতে আর লেখা নিয়ে আসতে চারুবাবু মাঝে মাঝে কবির সঙ্গে জোড়াসাঁকোয় দেখা করেন।

সেবার হঠাৎ কবি চলে গেছেন শিলাইদহে। অথচ কবির লেখা না পেলে প্রবাসী কাগজ প্রকাশ করা যাচ্ছে না।

হঠাৎ কবির কাছ থেকে চিঠি এলো, তিনি চারুবাবুকে শিলাইদহে চলে যেতে বলেছেন।

খবর শুনে চারুবাবু খুব খুশী। এই ফাঁকে ভ্রমণ যোগ আর কবির সাহচর্য লাভ। যথা সময়ে তিনি শিলাইদহে গিয়ে হাজির হ'লেন।

কবি তখন পদ্মার বুকে বজরার ছাদের ওপর বসে প্রাকৃতিক শোভা নিরীক্ষণ করছিলেন। চারুবাবুকে আসতে দেখে মাঝিকে বললেন, একটা তক্তা ফেলে দাও। চারুবাবুকে বজরার ওপর উঠতে হবে ত?

তারপর কবি একটু এগিয়ে এসে কৌতুকের সুরে বললেন, ওহে চারু, একটু সাবধানে পা ফেলো, এ তোমাদের জোড়াসাঁকো নয়।

বাঁদোর

জোড়াসাঁকোর "বিচিত্রা ভবনে" কবি এক সাহিত্য সভা ডেকেছেন।

কলকাতার নাম করা সাহিত্যিকরা সবাই উপস্থিত। কবি নিজে তার একটি রচনা পাঠ করে সকলকে শোনাবেন। সেই জন্য উপস্থিত সাহিত্যিকবৃন্দ বিশেষ উৎসুক।

হঠাৎ কবি সামনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে চীৎকার করে উঠলেন, বাঁদোরটা বন্ধ করো—

কবির মুখে এই কথা শুনে সবাই হকচকিয়ে গেল, এখানে বাঁদোর কোথায়? তবে কি বাড়ীর কোনো পোষা বাঁদর শিকলি কেটে পালিয়ে এসেছে?

বাঁদরের আঁচড়-কামড়ের ভয়ে সকলেই সচকিত হয়ে উঠলেন। চারিদিকে তাকাতে লাগলেন। অনেকে কবির মুখের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে রইলেন। আবার কেউ কেউ কেউ বাঁদরের ভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

বিচিত্রা ভবনের শান্ত পরিবেশে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। কিন্তু কেউ সেই কবি-কথিত বাঁদরের সন্ধান করতে পারলেন না।

কবি তখন গম্ভীর গলায় বললেন, আমি শুধু বাঁ দরজাটা বন্ধ করতে বলেছি—।

কবির রসিকতা বুঝতে পেরে উপস্থিত সাহিত্যিকবৃন্দ হেসে উঠলেন।

পাদুকা পুরাণ

জোড়াসাঁকোর এই "বিচিত্রা ভবনে" কবি আর একবার নাম করা সাহিত্যিকদের সাদর আহ্বান জানিয়েছেন। কবির আহ্বানে বাঙলা দেশের স্বনামধন্য সাহিত্যিকবৃন্দ এসে উপস্থিত হয়েছেন।

এই দলের মধ্যে শরৎচন্দ্রও আছেন। কিন্তু তিনি শুনতে পেয়েছেন বিচিত্রা ভবনের বাইরে জুতো খুলে রাখলে সেটি খোয়া যায়।

তাই সাবধানী শরৎচন্দ্র তাঁর জুতোজোড়াকে ভালোভাবে কাগজ দিয়ে জড়িয়ে বগলদাবা করে নিয়েছেন। এখন আর কোনো ভয় নেই, জুতোজোড়া ত' সঙ্গেই থাকলো।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের সাবধানতার কথাকে কে যেন গিয়ে কবির কাণে তুলে দিয়েছেন। কৌতুকপ্রিয় কবি এই খবরে বিশেষ আমোদ উপভোগ করছেন।

জুতো বগলে শরৎচন্দ্র একেবারে সামনে গিয়ে আসন গ্রহণ করতেই রহস্য প্রিয় কবি বলে উঠলেন, এই যে শরৎ, এসো এসো, কিন্তু তোমার বগলে ওটা কি বস্তু? পাদুকা পুরাণ নাকি?

লজ্জায় শরৎচন্দ্র আর কথা বলতে পারেন না।

পদে পদে বিপদ

একদিন কবির পায়ে কি একটা ব্যথা হয়েছে। তাই ব্যাণ্ডেজে বেঁধে রাখা হয়েছে। সেই দিন কবির এক প্রিয় শিষ্য কবিকে দেখতে গেছেন। কিন্তু কবির পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দেখে শঙ্কিত হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ কি আপনার পায়ে আবার কি হল?

কবি সহজাত কৌতুক-প্রিয়তার সঙ্গে উত্তর দিলেন, দেখতেই ত' পাচ্ছ, পদে পদে বিপদ।

হত্যা করে পূজো

এই কৌতুককণাটা অবশ্য কবি রবির নয়। কবি নজরুল ইসলামের। তবে ঘটনাটা কবিকে নিয়েই। কবি রবি তাঁর একখানি বই কবি কাজী নজরুলকে উৎসর্গ করেন। যতদূর মনে পড়ে বইটি হচ্ছে "বসন্ত"।

এই বসন্ত নাটকটি তাঁর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে দেখে নজরুল যেন একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলেন। বইখানি হাতে পেয়ে চীৎকার করে উঠলেন, আমি কবিকে হত্যা করবো। উপস্থিত বন্ধুর দল সবাই হতবাক্। নজরুল বলেন কি! স্বয়ং কবি কে হত্যা?

নজরুল তখন সকলের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন, হত্যা করে কবির মূর্ত্তি গড়িয়ে পূজো করবো।

তারপর নজরুলের সেই আকাশফাটা হো-হো হাসি।

প্রতিশোধ নিয়েছি

এই কৌতুক কাহিনীটি শরৎচন্দ্র ও কবিকে কেন্দ্র করে। অনেক দিন আগের কথা। শরৎচন্দ্রের কিন্তু খুব ইচ্ছে যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ষোড়শী নাটকের গানগুলি রচনা করে দেন।

এই উদ্দেশ্য নিয়ে শরৎচন্দ্র কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং নিজের মনোবাসনার কথা কবিকে নিবেদন করেন। যে কোন কারণেই হোক, কবির পক্ষে 'ষোড়শী' নাটকের সঙ্গীত রচনা করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

তারপর যথারীতি নাট্যাচার্য শিশির কুমার এই ষোড়শী নাটকের রূপদান করেন। আর এই নাটকটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

পরবর্তী কালে শরৎচন্দ্র তাঁর বন্ধু মহলে কৌতুক করে বলেছিলেন, আমি এই কাজের জন্যে কবির ওপর প্রতিশোধ নিয়েছি। গিরিজা কবির সঙ্গে তাই আলাপ করিয়ে দিয়েছি। কবি গিরিজা কবিতা শুনিয়ে তাঁর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে।

বাংলা ও ইংরাজী

কবির কাছে এক তরুণ মাঝে মাঝে আসত। তার ধারণা ছিল যে, বাঙলা আর ইংরাজী—এই দু'টী ভাষাই সে খুব ভালো জানে।

নিজের রচনা সঙ্গে করে নিয়ে আসে—কিন্তু কবিকে দেখাবার সাহস হয় না। তাই বারে বারে ফিরে যায়। কিছুদিন বাদে তার ধারণা

হল, বাঙ্‌লা থেকে ইংরাজীটা সে আরো ভালো জানে। তাই একদিন সাহসে ভর করে তার একটি ইংরাজী রচনা কবিকে দেখতে দিল। তরুণটির মনে মনে এই বিশ্বাস ছিল যে, কবি নিজে ভালো ইংরাজী জানেন না। তাই ওর ইংরাজী রচনার মুন্সীয়ানা দেখে নিশ্চয়ই তিনি তারিফ করবেন।

কিন্তু কবি ইংরাজী পড়ে মুখ বাঁকালেন। মৃদু হেসে বললেন, তোকে নিয়ে মহা বিপদ হল।

তরুণ হকচকিয়ে গিয়ে শুধোলে, কেন, কেন?

কবি আবার কৌতুকের সুরে বললেন, তুই বাংলাটাও ভুলে গেলি, আবার ইংরাজীটাও শিখলি না। তোকে নিয়ে ত' আচ্ছা বিপদ হল!

রবির আলো ও বিজলী বাতি

শেষবারের মতো যখন কবি শান্তিনিকেতন ছেড়ে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় রওনা হন, সেই সময় আশ্রমে লম্বা লম্বা থাম পোঁতা হয়েছে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কি তৈরী হচ্ছে রে?

একজন আশ্রমবাসী উত্তর দিলেন, বাঃ! আপনি জানেন না? আমাদের আশ্রমে যে এবার বিজলী বাতি আসছে।

কবি ক্ষণকাল চুপ করে রইলেন। তারপর কৌতুকের সুরে বললেন, ঠিক! ঠিক! রবির আলো চিরদিনের মতো নিভে যাচ্ছে ত! তাই তোদের আশ্রমে আসছে বিজলী বাতি!

শান্তিনিকেতন আশ্রমে রবীন্দ্রনাথের ফেলে আসা এই শেষ কৌতুককণা।

● আমি জানি অপরের কাছে আশ্রিত থাকলে রুটিতে মাখানো নুনের স্বাদও কেমন বদলে যায়, অপরের সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করাও কতটা পরিশ্রমের।

—দান্তে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য ঃ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে

সাক্ষাৎকারী : শ্রীগোপাল ভৌমিক

প্রকাণ্ড হিমালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে বদ্ধ-আস্থা মানুষ যেমন প্রথমটায় কিছুক্ষণ ধ্যানস্তব্ধ হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে, অটল ব্যক্তিত্বশালী প্রথিতযশা বাহাত্তর-বয়স্ক এই প্রবীণ সাহিত্যিকের সামনে উপস্থিত হয়ে অন্ততঃ কিছু-ক্ষণের জন্যও আমার সেই অবস্থা হয়েছিল। তারপর তাঁকে আমার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করায় তিনি সানন্দে আমার সংগে সহযোগিতা করতে সম্মত হলেন। তখন সর্বপ্রথম আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম : সাহিত্যিকদের প্রথম রচনা কোনটি কোথায় কখন সেটি সবার আগে প্রকাশিত হয়, এগুলি পাঠকদের সাধারণতঃ জানতে ইচ্ছা করে আপনার সম্পর্কেও সেই একই কথা আমার জানতে ইচ্ছা করছে।

উনি বললেন : বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্মরণ শক্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। কাজেই যথার্থ না হলেও জানাচ্ছি, ১৬/১৭ বছর বয়সে আমার প্রথম লেখা "মর্মবাণী" নামে একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এরপর আমি বললাম : সর্বক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও সাহিত্যিকদের জীবনে অনুপ্রেরকদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। আচ্ছা, প্রথম জীবনে এই লেখার অনুপ্রেরণা আপনি কোথা থেকে পান ?

একটু স্মৃতিচারণের ভঙ্গীতে স্তব্ধ থেকে উনি বলতে লাগলেন : প্রথম লেখার অনুপ্রেরণা পাই আমার মাতামহীর কাছ থেকে। তিনি অবশ্য লিখতে জানতেন না, কিন্তু তাঁকে প্রত্যহ বিকেল বেলায় একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ মহাভারত পড়ে শোনাতেন। তিনি আবার মহাভারতের গল্প রাত্রে শুয়ে শুয়ে আমাকে বলতেন। আমি আবার সেই সব গল্প কাগজে লিখতাম। এমনি করেই আমার লেখক-জীবনের সূত্রপাত।

এরপর আরো বিভিন্ন প্রশ্ন মারফৎ জানতে পারলাম ওঁর পিতার নাম ৺ধরণী ধর মুখোপাধ্যায় এবং মাতা হেমলতা দেবী। ছোট-বড় বিভিন্ন লেখা মিলিয়ে তাঁর মোট রচনা সংখ্যা দুই শতাধিক হবে। প্রত্যহ কিছু না

কিছু লেখা ওঁর অভ্যাস। তাই বর্তমানে তাঁর একটি চোখ সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি-হীন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও উনি 'গল্প-ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক পদে আসীন আছেন এবং এখনও সাহিত্যচর্চা করে চলেছেন।

প্রশ্ন করলাম: আপনি তো চলচ্চিত্র-প্রযোজনার সংগে যুক্ত ছিলেন শুনেছি। আপনার রচিত ও প্রযোজিত কোন্ কোন্ বই মুক্তি লাভ করেছে এবং তন্মধ্যে সর্বপ্রথম ছবি কোন্‌টি—এ সম্পর্কে যদি কিছু বলেন—।

স্মিত হাস্যে উনি বলতে শুরু করলেন: আমার লেখা অনেক বই-ই ছবি হিসেবে মুক্তি পেয়েছে। 'নন্দিনী', 'বন্দী', 'শহর থেকে দূরে', 'মানে না মানা' ইত্যাদি ছবি যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই হয়ত সে কথা জানেন। তবে আমার সর্বপ্রথম ছবি হল 'পাতাল পুরী'।

এরপর আমি ওঁর কাছে জানতে চাইলাম: আচ্ছা, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় জীবনকাহিনীতে আপনার সংগে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ঘনিষ্ঠতার কথা আমি পড়েছি। এ সম্পর্কে আপনি কিছু আলোকপাত করবেন কি?

একটু খানি স্থির ভাবে থেকে উনি বলতে শুরু করলেন: নজরুল আর আমার বাড়ি ছিল এক জেলার একই জায়গায়। কাজেই আমরা দু'জনে বাল্যাবধিই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। প্রথম দিকটায় আমি লিখতাম কবিতা আর নজরুল লিখত গল্প। তারপর আমরা দু'জনে নিজেদের কলম বদলা-বদলি করে নিলাম। নজরুল হল কবি, আর আমি হলাম কথাকার। একদা আমি যখন 'কালি-কলম' পত্রিকার সম্পাদনা করতাম তার পৃষ্ঠাতে নজরুলের অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

সব শেষে প্রশ্ন করলাম: আচ্ছা, গত অর্ধশতাব্দী ধরে আপনি তো বাংলা সাহিত্যের সংগে যুক্ত আছেন, বলতে পারেন কি, ইদানিং আধুনিকতা, বাস্তবতা আর শিল্পের দোহাই দিয়ে যে-সব নোংরামি সাহিত্যাঙ্গণে প্রবেশ করছে, তাকে কলুষিত করছে, তার হাত থেকে সাহিত্যকে রক্ষা করা যায় কি করে?

: না ছেপে!

শ্রীমুখোপাধ্যায়ের এই বুদ্ধিদীপ্ত, সংক্ষিপ্ত অথচ তীক্ষ্ণ জবাবে চমৎকৃত না হয়ে পারলাম না। ঈশ্বরের কাছে এই প্রবীণ সাহিত্যরথীর সুস্থ দীর্ঘজীবন কামনা করে ঘরের দিকে পা বাড়ালাম।

নতুন বই

শ্রীসুবীর মুখোপাধ্যায়

মিশ্র সাহানা [উপন্যাস] ॥ শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় ॥ প্রকাশক : এম্. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড ; ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ॥ দাম : দশ টাকা ॥

শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের "মিশ্র সাহানা" একটি সুলিখিত চিত্তাকর্ষক উপন্যাস। 'সাহানা' একটি রাগিনীর নাম—বিষাদ ভারাক্রান্ত তার সুর। এই উপন্যাসের প্রধান পুরুষ ব্যর্থ-প্রেমিক চিরঞ্জীব চৌধুরী, সহ-নায়ক স্বজন বিয়োগ বেদনা-ভারাতুর সুনন্দ চ্যাটার্জী। চিরঞ্জীব তার ব্যর্থ-প্রেমের জ্বালাকে ভুলতে সুরার পাত্রকে হাতে তুলে নিয়েছে, সুন্দরী মারগারেটের সান্নিধ্যে গেছে, পাণিগ্রহণ করেছে আইরিণের, নিরীক্ষণ করেছে পুত্রমুখ রঞ্জনের আর সর্বোপরি লাভ করেছে অকৃত্রিম সুহৃদ সুনন্দের নিবিড় সংগ। সুনন্দেরও দীর্ঘ জীবনপথ পরিক্রমায় দেখি একদিকে যেমন অনেককে ছাড়ার হাহাকার আছে, তেমনি মিলেছে অনেককে পাওয়ারও আনন্দ। তবুও চিরঞ্জীব বা সুনন্দ শেষ পর্যন্ত কেউই যে পুরোপুরি সান্ত্বনা পেয়েছে এমন নয়—কিন্তু তাদের বিষাদের তীব্রতা কমবেশি কিছুটা নিচু খাদে নেমে এসেছে। অথচ, প্রধান পার্শ্ব-কাহিনীর নায়ক অতনুদার জীবনে সেই জাতীয় সান্ত্বনার বিন্দুমাত্র কোন স্পর্শ নেই। সম্পদের অপ্রাচুর্য, পুত্রবিয়োগ, গুণবতী পত্নীবিয়োগ এবং শেষ পর্যন্ত উপার্জনহীন-চক্ষুহীন অবস্থায় জীবনধারণ—অতনুদার জীবনে এই বিষাদের সুর ক্রমশই যেন উচ্চগ্রামে এসে ঠেকেছে। তাই বোধ করি চিরঞ্জীব তার বেহালা যন্ত্রকে একমাত্র অবলম্বন করে থাকে নি ; পক্ষান্তরে অতনুদার কাছে বেহালা যন্ত্রটাই হয়ে উঠেছে যেন জীবনের একমাত্র আশ্রয়!

এই উপন্যাসের নন্দমাসী-রাধা-নবদ্বীপ-স্টেশন মাস্টার-মাস্টার পত্নী, ম্যাকেঞ্জি-এথেল, চৌধুরী বংশের কীর্তিকথা প্রভৃতি অজস্র পার্শ্বকাহিনীর

ঢেউ এবং ভাগ্য-বিড়ম্বিতা দুর্গা, আদর্শ-শিক্ষক দীনবন্ধু চাটুয়েজ, কর্তব্যনিষ্ঠ মেহের আলি প্রভৃতির জীবনের সুখ-দুঃখ-প্রেরণা-ভক্তিময় বিভিন্ন সহ-সুর সংযোগের ফলে সৃষ্টি হয়েছে মিশ্র সাহানার। লবণের নিজস্ব স্বাদ যেমন মিষ্ট না হলেও তরকারিতে সংযুক্ত হলে তার মিষ্টতা বেড়ে যায়, তেমনি আলোচ্য উপন্যাসের সমস্ত সহ-সুরগুলি বিষাদময় না হলেও মূল সুরের বিষাদকে তা নিঃসন্দেহে বাড়িয়ে দিয়েছে। আর তার ফলেই সংস্কৃত আলংকারিকদের "সঙ্গম বিরহ বিকল্পে বরমিহ বিরহ" উক্তিকে সার্থক করে পাশ্চাত্ত্য আলংকারিকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "saddest thought" পরিণত হতে চলেছিল "sweetest songs"-এ। কিন্তু, বিপর্যয় ঘটিয়েছে মৃত্যুর সংখ্যাধিক্য। চারশত পৃষ্ঠার একটি উপন্যাসে অতনুদার স্ত্রী-পুত্র, নন্দমাসী, মারগারেট, এথেল, দুর্গা প্রভৃতি অজস্র চরিত্রের মৃত্যু না হলে বিষাদ হয়ত আরো কিছুটা দানা বেঁধে ওঠার সুযোগ পেত! মৃত্যুর এই সংখ্যাধিক্যই যেন উপন্যাসটিকে কিছুটা **Horror of Tragedy**-র দিকে ঠেলে নিয়ে গেছে।

এই উপন্যাসের আর একটা দিক হল সমাজ চিত্রাঙ্কন। সেদিক দিয়েও এই উপন্যাসের সাফল্য বড় কম নয়। ইংরাজ-শাসনে চৌধুরী-পরিবারের মতো এদেশে একদিকে তখন ফিউডালিজম-প্রথা ভেঙে পড়ছে এবং মোনা মিত্তিরদের মতো সমাজে এক শ্রেণীর আদর্শহীন উঠতি ধনীর সৃষ্টি হচ্ছে, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার ঢেউও জনমনকে আকৃষ্ট করছে তখন। চিরঞ্জীব চৌধুরীর জীবনে আমরা বনেদী ও উঠতি এই দু'জাতীয় অভিজাত সমাজ জীবনের ছাপই লক্ষ্য করতে পারি। পাশাপাশি মধ্যবিত্ত সমাজ কেমন করে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে, তার পরিচয় পাই অতনু-সবিতাদের জীবন থেকে।

কাহিনীগত আকর্ষণ সৃষ্টি, পদবিন্যাস ও উপমা নির্বাচনে লেখকের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, যখন তিনি বলেন "অতীতের চৌধুরী বংশ অত্যাচারে ছিল তৈমুরলঙ্গ, কোমলতায় শ্রীগৌরাঙ্গ"—তখন লেখকের উপমা নির্বাচন ক্ষমতায় আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না।

দুঃখের বিষয় গ্রন্থটির কোথাও প্রচ্ছদ চিত্রশিল্পীর নাম উল্লিখিত হয় নি, যদিও তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক হয়েছে।

শব্দ-জব্দ

শুক্লা চট্টোপা

[৩নং শব্দজব্দ প্রকাশ করা হ'ল । যাঁর সব উত্তর সঠিক হবে প্রথম পুরস্কার দশ টাকা এবং যার একটি মাত্র উত্তর ভুল হবে দ্বিতীয় পুরস্কার পাঁচ টাকা দেওয়া হবে । আগামী শ্রাবণ সংখ্যায় সমেত সঠিক উত্তর দাতার নাম প্রকাশ করা হবে । 'নবকলি' কর্তৃপ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে । সম্পাদক, নবকলি ।]

॥ ছক ॥

১		২		*	৩
	*		*	৪	
৫				*	
	*	*	*	৬	
*	৭	৮	*		*
৯			*	১০	

॥ সূত্র ॥

পাশাপাশি ঃ

১। যেমোনা পথিক চলো অবিরাম
দেখবে কত গিরি-নগর-ধাম।
৪। নাম শুনলেই ভয় হয়
দূরে থাকলে ভালো হয়।
৫। স্বাধীনতার তরে উৎসর্গিত প্রাণ
এলোমেলো শব্দ আগে সাজান।
৬। সংখ্যা ছাড়া অন্য কিছু নয়
হিসেব মিলিয়ে বললেই হয়।
৭। উল্টো কথা সোজা করে বলো
প্রভাত হয়েছে এবার জেগে ওঠো।
৯। ক্লান্ত দিনের শেষে সবার আশ্রয়।
১০। মহাবলী পশু পাবে যেথায়
ধাঁধার মজা তাইতো সেথায়,
সোজা কথা বলতে যদি চাও
ভাব্‌বার আগে সোজা করে নাও।

উপর নীচ ঃ

১। বিরহী কে তুমি দাঁড়ায়ে আছো ?
২। যেখানে খুসী রাখো তার-ই রূপ নেবে
উল্টোপাল্টা কথা সোজা করে ল'বে।
৩। উৎসর্গিত।
৬। যাঁর প্রতীক্ষায় রয়েছো তুমি
তাঁর দেখা পেয়েছো জানি।
৭। সোজা করে নাও
সমুদ্র দেখতে পাও।
৮। বংশধর।

নাট্যকলা সৃষ্টির নতুন যুগে

নাটুকে বাবু

নাট্যকলা সৃষ্টির নতুন যুগে জনগণের হাতে এসেছে নাট্যরস সৃষ্টির চাবিকাঠিটি, অর্থাৎ জনগণই শিল্প সৃষ্টির মূল কর্তা। কিন্তু নাট্যশিল্পকে গণ-শিল্প ও গণ-সংস্কৃতিতে প্রকৃত উত্তরণের দায়দায়িত্ব আজ আমার আপনার মত সাধারণ মানুষের হাতে এসে পড়েছে, এ কথাটা আমরা বার বার ভুলে যাই। তাই বুঝি আজও ক্যাবারে নৃত্য সমৃদ্ধ নাট্যকলা, পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ এবং দৈনিক পত্রিকার (বহুল প্রচারিত) পূর্ণ-পাতার সচিত্র বিজ্ঞাপন সহ সদম্ভে বিরাজমান। কিম্বা কিশোর কুমার নাইট্-সের চটুল গানের গমক এই মাগ্‌গি গণ্ডার দিনেও জনগণের সাদা-কালোমার্কা পকেট হ'তে নিপুণ হস্তে নির্বিচারে ১৫/২৫ টাকা ছিন্‌তাই করে নেয়; আর এই ভাবেই তৈরী হ'য়ে চলে আমাদের আশপাশের জন মানস। কারণ, পূজা-পার্বণ, বিবাহ-শ্রাদ্ধ ও অন্নপ্রাশনের আসর বা বাসর ঐসব বিদঘুটে চটুল গানের গমকে-ঠমকে ভরে ওঠে। অর্থাৎ নব্য শিল্প-সংস্কৃতির খোলসে ইচ্ছাকৃতভাবে জনগণকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করবার এক রহস্যময় প্রচেষ্টা সর্বদিকে প্রকটভাবে আজও গতিময়।

নাট্যকলা সৃষ্টির পূর্বতম রীতি পদ্ধতি অনুযায়ী মধ্যযুগ হ'তে নাট্যজগৎ পরিচালিত হয়েছে রাজা, ডিউক, জমিদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত সামন্ত প্রভুদের মুখের দিকে তাকিয়ে; তাঁদেরই মনস্তুষ্টি বিধানের প্রয়োজনে দেশীয় জনমানসকে বাঁধাধরা রীতিনীতি সংক্রান্ত বিদ্যার বাঁধনে সীমাবদ্ধ করে'। আর তারই ফলে আমাদের শিল্পকলা-সাধনায় এক অসীম পরনির্ভরতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

কিন্তু এখন নতুন মানুষ, নতুন দর্শক, নতুন প্রয়োজন। এহেন নতুন যুগকে বরণ করবার জন্য দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে নতুন যুগের দর্শক মন। তাই বুঝি মঞ্চশিল্পী, অভিনেতা, নাট্য পরিচালক সকলের

মনে বিরাট জিজ্ঞাসা—আজও কেন দেশের বড় বড় নাট্যশালা বা নাট্য প্রচেষ্টার দরজা দেশের অধিকাংশ মানুষ, যারা দরিদ্র, অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত, তাদের কাছে অপ্রবেশ্য ?

প্রকৃত সমাজ বিপ্লবে দেশীয় শিল্প-সংস্কৃতি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ প্রকৃত শিল্প বিপ্লবে কেবল মাত্র জনগণের স্বার্থেই জনগণের সঙ্গে যোগাযোগের শিল্প-সংস্কৃতির মাধ্যমকে ব্যবহার করা যেতে পারে। এসব কারণেই জাতীয় শিল্প ও সংস্কৃতিতে অনগ্রসরতার সমস্যার কথা যাঁরা চিন্তা করেন সে সব বুদ্ধিজীবির সকলকেই আজ এগিয়ে আসতে হবে। জনগণের কাছে তাঁদের স্রষ্টা, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর ভূমিকা পালন করতে হবে। জনমানসের বিপ্লবী চিন্তাধারাকে সঠিক-ভাবে রূপ দিতে হ'লে নতুন যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক সমস্যাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে নাট্যশিল্পের মাধ্যমে। আর সে নাট্যশিল্পকে প্রকৃত জন মানসের মুকুর ক'রে তুলতে হবে। অর্থাৎ সেখানে বর্তমানের জাতীয় পরিস্থিতির নতুন নতুন দিকগুলোকে এমন সহজ সরলভাবে একনিষ্ঠতার সঙ্গে তুলে ধরতে হবে সাহসী মনোভাব নিয়ে, যার দ্বারা প্রতিটি জনমানসের বৈপ্লবিক চেতনা ও সক্রিয়তা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। আর তারই সাথে সাথে সমালোচনামূলক মনোভাব নিয়ে অতীতের সবচেয়ে ভাল উপাদান-গুলোকে আমাদের রক্ষা করতে হবে, আবার জনমানস বিশ্লেষিত কল্পনা ও সাহস পাথেয় করে নতুন যুগের সম্ভাবনাপূর্ণ নাট্য রস সৃষ্টির দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এর ফলে শিল্প-বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে অগ্রগামী বুদ্ধিজীবি এবং সমাজের অনগ্রসর জনমানসের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার যোগসূত্র স্থাপিত হবে। আর এই বিরাট কর্ম যজ্ঞে জনগণের প্রতিদিনের শ্রম ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে দেশীয় শিল্পকলার উপর সমগ্র জনসাধারণের অধিকারবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে।

সর্বোপরি আশা করব, নতুন যুগ সন্ধিতে এরূপ সৃজনশীল প্রচেষ্টা জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার উপর ভিত্তি করে আপামর জনগণের কাছে সমাদৃত হবে এবং তারই সাথে সাথে জাতি ও পৃথিবীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ হয়ে দুনিয়ায় সত্য ও সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করবে।

Declaration Of Ownership & Other Particulars

Form—IV

1. Place of publication — Calcutta

2. Periodicity of publication— Quarterly

3. Printer's Name — Sm. Ira Dutta

   Nationality — Indian

   Address — G/4, H. E. / L. I. G.
   37, Belgachia Rd., Cal-37.

4. Publisher's Name — Sm. Ira Dutta

   Nationality — Indian

   Address — G/4, H. E / L. I. G.
   37, Belgachia Rd., Cal-37.

5. Editor's Name — Sri Nani Gopal Dutta

   Nationality — Indian

   Address — G/4, H. E. / L. I. G.,
   37, Belgachia Rd., Cal-37.

6. Owner's Name — Sm. Ira Dutta

Dated, the 28th February,
1974.

Sd./—Ira Dutta
Publisher.

২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
Regn. No.
R. N. 24644/72

নবকলি

মূল্য—৫০ পয়সা

NABAKOLI
বৈশাখ, ১৩৮১
April—June '74

পশ্চিমবংগ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত
দু'টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর

মূল্য : পাঁচ টাকা

চিন্তা-ভাবনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক ও অন্যান্য যাঁদের বিশিষ্ট অবদান আছে, তাঁদের চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধাদি এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। যাঁরা পশ্চিমবংগের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পুনরুজ্জীবনে গভীরভাবে আগ্রহান্বিত তাঁদের কাছে এই গ্রন্থটি মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে।

●

পশ্চিমবংগের লোক সংস্কৃতি

মূল্য : সাড়ে পাঁচ টাকা

লোক-সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক ও অনুরাগীদের পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক সংকলন গ্রন্থ।

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

প্রকাশন-বিভাগ, পশ্চিমবংগ সরকারী মুদ্রণালয়
৩৮, গোপালনগর রোড, কলিকাতা-২৭

প্রকাশন-বিক্রয়কেন্দ্র, নিউ সেক্রেটারিয়েট
১, কিরণশংকর রায় রোড, কলিকাতা-১

পঃ বঃ (তথ্য ও জনসংযোগ) ১১৬৬/৭৫

শ্রীমতী ইরা দত্ত কর্তৃক ফ্ল্যাট নং জি/৪, হাউজিং এস্টেট, এল. আই. জি., ৩১, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্টার প্রিন্টার্স ৭৬, বিপিন বিহারী গাংগুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।